দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ক্ষমতা হস্তান্তর ১৫ আগস্ট
এবং মধ্যরাত্রে কেন?
— পৃঃ ২৩

এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে
পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ১১ আগস্ট, ২০২৫।। ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

পনেরই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

৭৭ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১১ আগস্ট - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

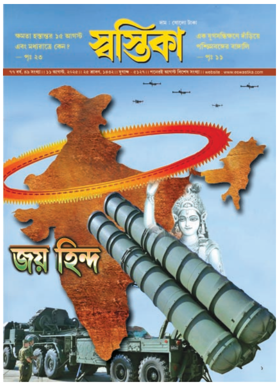

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

জাতীয় ভাষার সমান্তরাল সর্বনাশী খেলা :

নিবিড় ঘন আঁধারে ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মোদীজীর চেয়ে 'চালাক' দিদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ব্রিকস কি ট্রাম্পের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে? ◻ অশ্বনী মহাজন ◻ ৮

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ৬ লক্ষ আসন খালি থাকাটা কীসের সংকেত? ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা—এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ১১

দেশ রক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনী ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৪

বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন : পাকিস্তানি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চলমান ইতিহাসের একটি পর্যালোচনা ◻ দেবজিৎ সরকার ◻ ১৭

ক্ষমতা হস্তান্তর ১৫ আগস্ট এবং মধ্যরাত্রে কেন? ◻ ডাঃ মধুসূদন পাল ◻ ২৩

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ◻ সত্যানন্দ গুহ ◻ ৩১

অখণ্ড ভারতের পূজারি শ্রীঅরবিন্দ ◻ রাজদীপ মিশ্র ◻ ৩৩

১৬ আগস্ট ১৯৪৬—কলকাতায় হিন্দুনিধন ও প্রতিরোধ ◻ ড. গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৩৬

বিরল নির্লোভ চরিত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামী ◻ মিঠু চক্রবর্তী ◻ ৩৮

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন—বঙ্গের অবদান, বাঙ্গালির প্রাপ্তি ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ৪৩

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননা নাটকের বলি হিন্দুরা ◻ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ◻ ৪৫

মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে নতুন দ্বিজাতিতত্ত্ব : বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালি ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৪৬

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানগত পরিবর্তন : রাজনৈতিক অধঃপতনের একটি দৃষ্টান্ত ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৯** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১৮ আগস্ট
২০২৫

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৮ আগস্ট
২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভুয়ো ভোটার ও অনুপ্রবেশকারী

ভুয়ো ভোটার একটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। আর এই ভুয়ো ভোটারের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীরা যুক্ত হলে তা আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন ভুয়ো ভোটারের খোঁজ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর নাম ভোটার তালিকায় আবিষ্কার করেছে। রাজনৈতিক বিরোধীরা তাদের ভোটব্যাংকের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরোধিতায় নেমেছে। যা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে উদ্বেগজনক।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোচনা করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার মর্ম

স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৫ আগস্ট দিনটি ভারতবাসীর নিকট যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের দিন। হর্ষ এই কারণেই যে এই দিনেই ভারতবাসী দীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে। বিষাদ এই কারণে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ১৯৪৭ সালের মধ্যরাত্রিতে যখন ক্ষমতার হস্তান্তর চলিতে ছিল, দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী যখন আবেগমথিত কণ্ঠে ভাষণ দিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাটি হিন্দুর রক্তে লাল হইতেছিল। দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন আনন্দে উদ্বেল, তখন ভিটেমাটি হারা, স্বজন হারা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর কান্নায় ভারতের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইতেছিল। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন সেই হুতাত্মা পরিবারগুলির মানুষজন স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে বিদেশি নাগরিক হইয়া গেলেন। তাঁহারা তো দেশ বিভাজন প্রত্যাশা করেন নাই! ইতিহাস সাক্ষী, কতিপয় জাতীয় নেতার অদূরদর্শিতায় তাহা ঘটিয়াছে। ক্ষমতা ভোগ করিবার শীঘ্রতায় তাঁহারা সেইসময় পূর্ববঙ্গের বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্য সেন, প্রীতিলতাদের পরিবারের কথা, লাহোরের ভগৎ সিংহ-সহ লক্ষ লক্ষ পরিবারের কথা ভাবিবার অবকাশ পান নাই। স্বাধীন দেশের শাসন ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুদিগের কথা একবারও চিন্তা করেন নাই। সেই হতভাগ্য হিন্দুদিগের কথা যিনি ভাবিয়াছিলেন সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বলিয়া দাগিয়া দিয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া শুধুমাত্র একটি পারিবারের গুণগান করিয়া আনন্দ উৎসবেই দিনটি তাঁহারা অতিবাহিত করিয়াছেন। দেশ বিভাজনের বিভীষিকার করুণ কাহিনি বর্তমান প্রজন্মের নিকট তুলিয়া ধরেন নাই। ঋষি অরবিন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী— 'দেশ বিভাজন কৃত্রিম, তাহা একদিন অপসৃত হইবেই' বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করানো হয় নাই। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হইতে আগত শরণার্থীদিগকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করিবার কথাও তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দীর্ঘদিন কংগ্রেসি শাসনে দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ লওয়া হয় নাই। বরং সর্বপ্রকারে দেশকে লুণ্ঠন করিবার প্রতিযোগিতা দেখা গিয়াছে।

ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, গত এক দশক হইতে দেশে স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশবাসীকে স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য ১৪ আগস্ট দিনটিকে 'বিভাজন বিভীষিকা দিবস' রূপে পালন করা হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী সভা সমিতির আয়োজন করিয়া দেশ বিভাগের ক্ষত এবং স্বজন হারানোর করুণ কাহিনি স্মরণ করা হইতেছে। দেশের স্থানে স্থানে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং হুতাত্মাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সংগ্রহশালা স্থাপন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিবার মতো বিষয় হইল, ১৯৪৭ সাল হইতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ স্বাধীনতা দিবসের দিনটিকে অখণ্ড ভারত দিবস রূপে সংকল্প গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৭৮ বৎসরের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এক দশকের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী এক দেশপ্রেমের স্ফুরণ অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরেই ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি এবং দেশ বিরোধী শক্তি দেশকে পশ্চাদপদ করিবার জন্য সতত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। দেশের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ যে শত্রুদেশ পাকিস্তানের পক্ষে রহিয়াছেন তাহা পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমেই স্বীকার করা হইয়াছে। দেশবাসী দেখিতেছে, দেশের নির্বাচন কমিশনের সদর্থক পদক্ষেপের বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী-সহ প্রতিপক্ষের নেতৃবৃন্দ কীভাবে করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন ও স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞকে কীভাবে উপহাস করা হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও দেশ আজ অগ্রগতির পথে চলিতেছে। ইহার কারণ, বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতার মর্ম দেশবাসীকে উপলব্ধি করাইতে সক্ষম হইয়াছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। মনে রাখিতে হইবে, স্বাধীনতা দিবস শুধুমাত্র হই-হুল্লোড়ের দিন নহে, দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার সংকল্প গ্রহণের দিনও বটে।

সুভাষিতম্

তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্।। (বিষ্ণুপুরাণ)

যে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, বাস্তবে তাই-ই কর্ম। যে বিদ্যা মুক্ত করে (অজ্ঞান থেকে),তাই-ই বাস্তবে বিদ্যা। বাকি সব কর্ম শ্রম মাত্র। বাকি সমস্ত বিদ্যা কলা কুশলতা মাত্র।

জাতীয় ভাষার সমান্তরাল সর্বনাশী খেলা

নিবিড় ঘন আঁধারে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে দু'জনেই খন্দে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ বাংলাভাষাকে তুলে ধরে বাঙ্গালিকে পথ চেনাতে চাইছেন। বাংলা দৈনিকের এক পুরনো সম্পাদকের ভাষণ শোনার অভিজ্ঞতা হলো এই প্রতিবেদকের। আলুলায়িত ও অপ্রকৃতিস্থ চিন্তা দিয়ে তিনি দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে, বাঙ্গালি জাতি কীভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। দু'একটা নোবেল পুরস্কার, কিছু সাবেকি বাঙ্গালি চিত্র পরিচালক আর কবির দল ছাড়া এ জাতির দেশে বিদেশে কোথাও ঠাঁই নেই। বাংলা সিনেমার অধোগতি যে বাঙ্গালির পতনের একটি দিকনির্দেশ করছে— সেই হাস্যকর সমীকরণও তিনি টেনেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা তার থেকে পৃথক নয়। কারণ তৃণমূলনেত্রীর 'বাঙ্গালি জাগো' স্টাইলের দাবি তার উলটপুরাণ নয়। তারা যেখানে অপ্রকৃতিস্থ ভাবনার সওয়ারি, চরম উত্থান ও পতন সেখানে কেবল ধ্রুবক। একসময় 'আমরা বাঙ্গালি' বলে একদল মানুষ রেল স্টেশনের ইংরেজিতে লেখা নাম আর হোর্ডিঙে কালি লেপে বাংলায় লিখতে শুরু করেছিল। কিছু পরিত্যক্ত বামপন্থী তার নতুন সূচনা ঘটিয়েছে। বাতিল হয়ে যাওয়া বাম মানসিকতার অকিঞ্চিৎকর অভিনেতারা তাতে জুড়ে গিয়েছে। সবাই মিলে সনাতনী হিন্দুত্ব ভাবনার প্রবল চাপ সামলাতে না পেরে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছাতার তলায় জড়ো হয়েছে।

১৯৭৭ সালের বামবিরোধী ভোট ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১-তে ৪৮ শতাংশে থামে। ২০১৯-এর পর থেকে বিজেপি এই রাজ্যে ৩৯ থেকে ৪১ শতাংশ ভোটের ধারা বজায় রেখেছে। এই ধারা বজায় থাকলে তৃণমূলের ৪৫ শতাংশ ভোটকে তারা শীঘ্র পেরিয়ে যাবে। ভাষার খেলায় তৃণমূলনেত্রী জিতলে রাজ্যবাসী, প্রকৃত বাঙ্গালিদের কপালে দুঃখ রয়েছে! এক অসম্ভব ভাবনায় বুক বেঁধেছে তৃণমূল। এক বিধায়কের দাবি ভুয়ো ভোটার আর বাংলাভাষার কালা জাদুই আগামী ভোটে মুখ্যমন্ত্রীর তুরুপের তাস। একটাই সমস্যা যে, বাংলাভাষা নিয়ে মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরির দক্ষতা তৃণমূলনেত্রীর দল বা প্রশাসনে কারুর নেই। তার রাজনৈতিক ইতিহাসের সত্য ন্যারেটিভটা ঘুরিয়ে দিতে পারে তেমন কেউ নেই। তার দলের সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বিজেপিকে বহিরাগত বর্গী বলে তৃণমূলনেত্রীর আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেটাই নাক ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। অথচ দিল্লিতে 'অবাঙ্গালি' কেন্দ্রীয় সরকারে চারবার মন্ত্রী হতে লজ্জা পাননি তৃণমূলনেত্রী। প্রথমে তেলুগুভাষী প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার, তারপর তিন বার প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারে দু'বার এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকারে মন্ত্রী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মা গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কি 'বাঙ্গালি' হয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন? সারাটা জীবন অবাঙ্গালিদের দাক্ষিণ্যে বেড়ে ওঠা তৃণমূলনেত্রীর বাঙ্গালিয়ানা নাটুকেপনার অধিক! তিনি বাঙ্গালি আর বাংলাভাষা নিয়ে ডাহা মিথ্যা বলছেন। উদ্দেশ্য হলো বেআইনি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের রাজ্যে ঘর পাইয়ে দিয়ে সেই অবৈধ ভোট পকেটস্থ করা। দিল্লিতে কর্মরত থাকাকালীন এই প্রতিবেদকের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। তখন দেখা যেত তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী ধরনের রাজনৈতিক সমর্থন ও সাহায্য করতেন অরুণ জেটলি, মণিশঙ্কর আইয়াররা। বিজেপির দুই মন্ত্রী তপন শিকদার ও সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের (জলু বাবুর) সঙ্গেও তার প্রভূত সখ্যের কথা রাজনৈতিক মহলে সর্বজনবিদিত ছিল। ২০০০-০১ সালের তহলকা কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যাবিনেট মন্ত্রীপদ ছেড়ে দিলে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দলের ভিতর অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণী, অরুণ জেটলিরা যেভাবে লড়েছিলেন তা নজিরবিহীন। আজকে তাঁদের রাজনৈতিক উত্তরসূরীদের 'বাঙ্গালি হন্তা' সাজাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। এটা লজ্জার যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে নিজের ইতিহাসকেই আজ অস্বীকার করছেন! তার ঝুঁটি নেড়ে এ মাস থেকেই রাজ্য জুড়ে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতে চলেছে। তাতে তৃণমূলনেত্রীর ঘুম উড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সত্যনিষ্ঠার প্রতি ভরসা না রেখে তার বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়েছেন যে, তার ভোট জেতার আড়ালে 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'।

এর আগে ১৯৯৭ সালে অসমে এবং ২০০৩ সালে বিহারে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছিল। বিদেশি সিপিএমকে তাড়াতে সেই সময় তৃণমূলনেত্রী এই রাজ্যে তা চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন। এখন তিনি বুঝেছেন যে, ভুয়ো ভোটারের ভূত তাড়াতে রাজ্যের মানুষ নির্বাচন কমিশনের ওঝা ডাকছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা বোঝাচ্ছে যে, ভুয়ো ভোটারের বেশিরভাগটাই তার ভোটব্যাংকের অংশ। কোনো অন্যায় হলে বা জোর করে কারও নাম বাদ গেলে তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিক, এমনকী সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত রয়েছে। তাহলে কাকে বা কীসে ভরসা করেন মুখ্যমন্ত্রী? মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের নীচু তলার (বিএলওদের) উদ্দেশ্যে হুমকি দিচ্ছেন। তার সামনে নিবিড় ঘন আঁধার। তার পায়ের নীচে মাটি কি সরছে?কিন্তু কতটা?

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মোদীজীর চেয়ে 'চালাক' দিদি

অসত্যপ্রেমীষু দিদি,

আপনি কিন্তু জোড়া মিথ্যা বলেছেন দিদি। আপনার এত প্রিয় ভাই হয়েও, আপনার চির অনুগত হয়েও তা না বলে পারছি না। বেশি খারাপ লাগছে এটা ভেবে যে, নবান্নে বসে রাজ্যের সব মানুষকে জোড়া মিথ্যা বলেছেন আপনি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। খারাপ লেগেছে কারণ, রাজ্যের প্রধান সচিবালয়ে আপনি যেখানে বসেন তার ঠিক পিছনেই রয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। দিদি, জাতীয় পতাকার সামনে বসে গণতান্ত্রিক দেশের এক নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা বলছেন তা একদমই শোভা পায় না। সেই সঙ্গে দিদি, আপনার দলের ভাড়াটে সংস্থা আইপ্যাকের কাণ্ডকারখানা নিয়েও অনেক প্রশ্ন আমার। মনে হয়, এই প্রশ্ন রাজ্যের সব বাসিন্দারই। সবাই বুঝছে আপনি যেটাকে 'বুদ্ধি' ভাবছেন, সেটা আসলে 'চালাকি', যার দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না।

রাজ্য সরকার তথা আপনার উদ্যোগে ভোটের আগে ভোটারদের জন্য ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা করেছেন। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প। বুথ পিছু দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। প্রতি বুথে এক হাজার ভোটার ধরলে মাথা পিছু এক হাজার টাকা। কিন্তু দিদি, ভোটের আগে এইসব কাজ কেন হবে? আপনি তো বলেছেন ৯০ শতাংশ কাজই হয়ে গিয়েছে। তার পরেও? জানি, আসলে ভাইদের ধনী বানাতেই এই উদ্যোগ। আসলে সরকারি নয়, আইপ্যাকের ঠিক করা তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি। আগে যেমন 'দিদিকে বলো' হয়েছিল, তেমনই 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। বুদ্ধি বটে আপনার! ভালো হবে তৃণমূলের সংগঠনের আর খরচ হবে সরকারের। সেটাও আবার রাজ্যের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা। দিদি, আপনার ভাষায় মোদীবাবুর টাকায়।

প্রকল্প ঘোষণার দিনই আপনি 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি' টাইপের কথাবার্তার ঢঙে বলেছিলেন এটা রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক কর্মসূচি। কেন বলতে গেলেন? তাতেই তো ধরা পড়ে গেলেন। কথায় বলে না, 'চোরের মন বোচকার দিকে'। আমি তখনই বুঝেছিলাম গোটাটা আইপ্যাকের পরামর্শে। পরে দেখা গেল ঠিকই। আইপ্যাক জেলায় জেলায় মেল পাঠিয়েছে। আর নাম রয়েছে নবান্নের পক্ষে আমলা শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জেলাশাসকদের কী করতে হবে সে সব জানিয়ে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আইপ্যাকে চাকরি করা আবেশ সিংহ। এটা আপনার প্রথম মিথ্যা ছিল যে, এই প্রকল্প নাকি সরকারি কর্মসূচি।

দিদি 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির জন্য টাকা জোগাড় করবেন বলে জানিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম নতুন করে ঋণ নিতে হবে। কিন্তু না। পরে দেখলাম, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকাতেই তৈরি হয়েছে গোটা প্রকল্প আর চালাকি করে নিজেরা তার কৃতিত্ব নিতে চাইছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন প্রতি আর্থিক বছরে গ্রামীণ পরিকাঠামো খাতে অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। প্রতি বছর একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এই খাতে কম-বেশি এককোটি টাকা পায়। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, 'টায়েড' অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু কাজে এবং 'আন-টায়েড' অর্থাৎ নির্ধারিত নয় এমন খাতে এই অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রাপ্ত অর্থের ৬০ শতাংশ খরচ হয় পানীয় জল, নিকাশি, সেচ, শৌচাগার নির্মাণের মতো বিভিন্ন 'বেসিক ফেসিলিটি' প্রদান বা গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে। কোন কোন খাতে অর্থ বরাদ্দ হবে তা কেন্দ্র ঠিক করে দেয়। বাকি ৪০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করার কথা রাস্তাঘাটের ছোটোখাটো মেরামত, কালভার্ট, ছোটো সেতু নির্মাণ, শ্মশান-কবরস্থান, ওয়াই-ফাই পরিষেবা ইত্যাদিতে।

নতুন প্রকল্পে যে কাজগুলি করতে বলা হয়েছে, তার বেশিরভাগটাই কেন্দ্রীয় বরাদ্দেই হয়ে আসছে। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতাতেও বিপুল টাকা পেয়েছে রাজ্য। তাতেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিকাশি, শৌচালয় ইত্যাদির কাজ হয়ে থাকে। ফলে পাড়া কর্মসূচির তালিকাভুক্ত কাজের বেশিরভাগটা কেন্দ্রীয় বরাদ্দেই সেরে ফেলা সম্ভব। শেষ বেলায় রাস্তা মেরামতকেও কাজের তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। সেই টাকাও কিন্তু কেন্দ্রের। কারণ, সম্প্রতি অন্তত ৩,৩০০ কিলোমিটার রাস্তার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। এ বাবদ খুব তাড়াতাড়ি কেন্দ্রের টাকা আসার কথা।

সকলের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি যে, ২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে গোটা দেশে ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজ শুরু হবে। গত ৩ ডিসেম্বর ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ড. অরবিন্দ পানাগড়িয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নবান্ন সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। কিন্তু নতুন টাকা পেতে গেলে তো আগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দেওয়া পুরো বরাদ্দ খরচ করতে হবে। এখন সেটাই করতে আট হাজার কোটি টাকা খরচের কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু এমন করে বলেছেন যেন, আপনি খুব চিন্তিত। কোথা থেকে যে টাকা জোগাড় করি এমন একটা ভাব আপনার কথাবার্তায়। খুব চিন্তার বিষয়। কেন্দ্র তো টাকাই দেয় না। কিন্তু দিদি, আমি যা হিসাব দেখলাম তাতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট বরাদ্দ করেছে ২১ হাজার ৬১১ কোটি টাকা। স্বীকার করলে কী ক্ষতি হতো দিদি!

□

অতিথি কলম

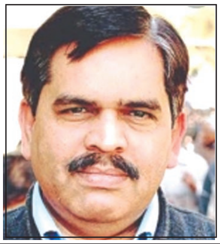

ড. অশ্বনী মহাজন

ব্রিকস কি ট্রাম্পের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে?

ব্রিকসের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভারত এই গোষ্ঠীকে আমেরিকা বিরোধী গোষ্ঠীরূপে কখনো দেখেনি, বরং ব্রিকস গোষ্ঠীকে বিশ্ব সংস্থার সংশোধনের জন্য উপযোগী একটি মঞ্চ হিসেবেই দেখে।

গত ৬-৭ জুলাই ব্রাজিলে ব্রিকসের ১৭তম শিখর সম্মেলন সম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনের গুরুত্ব হলো যে, এতে ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ইরান, মিশর, ইথিয়োপিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এই ৪ সদস্য দেশ গত বছর রাশিয়ায় আয়োজিত শিখর সম্মেলনে প্রথমবার সদস্য দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ২০২৫ সালের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রথম ব্রিকস সদস্য হয়। বর্তমানে ব্রিকস বিস্তৃত রূপ নিয়ে ‘ব্রিকস প্লাস’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই শব্দটি ২০২৪ সালে প্রথমবার ব্রিকস শিখর সম্মেলনে ব্যবহার করা হয়।

পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি

বিশ্বের উন্নত দেশ, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের প্রভাবকে রীতিমতো স্পর্ধা দেখাচ্ছে ব্রিক্স। আমরা যদি এই গোষ্ঠীর প্রথম পাঁচটি দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপর নজর রাখি, তাহলে ২০১০ সালে বৈশ্বিক মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) এদের অবদান ছিল ১৮ শতাংশ। ২০২৫ সালে তা বেড়ে গিয়ে ২৬.৫ শতাংশে পৌঁছবে। এখন তারা পশ্চিমি দেশগুলির আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি মুখোমুখি হতে শুরু করেছে। ডি-ডলারাইজেশন অর্থাৎ বাণিজ্য ও বিত্তের ক্ষেত্রে আমেরিকান ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কম করে পশ্চিমি ব্লকের আধিপত্য ভাঙার স্বর মুখর হচ্ছে। তারা বাস্তবে আমেরিকার আর্থিক ও ভূ-রাজনৈতিক অধিপত্যের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে চলেছে। এটি ভারত, চীন ও রাশিয়াকে বিশ্বমঞ্চে শক্তিশালী করছে। ডলার এবং পশ্চিমি সংস্থাগুলো থেকে মুক্ত হয়ে বৈশ্বিক আর্থিক পুনর্বিন্যাসকে উৎসাহিত করছে, যা প্রকৃতপক্ষে বহুমুখী বৈশ্বিক ব্যবস্থার প্রতীক এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তা সমর্থন করেন না। সম্প্রতি নতুন ৫ সদস্য যুক্ত হয়ে ব্রিকসের বিস্তার ঘটেছে। পশ্চিমি ব্লক, বিশেষত আমেরিকার তাতে চিন্তা বেড়েছে। ব্রিকস নিয়ে ট্রাম্পের বিরোধিতা ভূ-রাজনৈতিক ও আর্থিক উভয় কারণের ফসল, কেননা এই গোষ্ঠীর সম্প্রতি বিস্তারের সঙ্গে বৈশ্বিকস্তরে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তার কয়েকটা কারণ রয়েছে।

ব্রিকস নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষুব্ধ হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো আমেরিকান ডলারের আধিপত্যে হস্তক্ষেপ। বাণিজ্য ও আর্থিক বিষয়ে ব্রিকসের দেশগুলি আমেরিকান ডলারের উপর নির্ভরশীলতা কম করার প্রসঙ্গে আলোচনা করছে। অপরদিকে ট্রাম্প বরাবর ‘আমেরিকা প্রথম’-এর উপর জোর দিয়ে চলেছে এবং সেক্ষেত্রে এই সব দেশের ডলারের থেকে দূরত্ব গড়ে তোলার চিন্তা নিশ্চিতভাবেই আমেরিকার আর্থিক প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতার শক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো, পশ্চিমের প্রতি ব্রিকসের ভূ-রাজনৈতিক বিরোধিতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বড়ো চিন্তার কারণ। ব্রিকস নিজেকে জি-৭, আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো পশ্চিমি সংস্থার বিকল্প রূপে উঠে আসছে।

তৃতীয়, ব্রিকসের মাধ্যমে চীনকে বিশ্বস্তরে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মঞ্চ করে দিয়েছে। বিকেন্দ্রিকতার আড়ালের চীনের বৈশ্বিক বিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে আমেরিকা মনে করছে।

চতুর্থ, সৌদি আরব ও ইরান ব্রিকসে সম্মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠীর বৈশ্বিক ইন্ধনশক্তি (তেল) বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করবে। ডলার বহির্ভূত মুদ্রায় (ইউয়ান অথবা ব্রিকস মুদ্রা) তেল বাণিজ্যের সম্ভাবনা রয়েছে, যা পেট্রোডলার পদ্ধতিকেই দুর্বল করে ফেলবে।

পঞ্চম, ব্রিকসের বিস্তারের ফলে বৈশ্বিক দক্ষিণ (গ্লোবাল সাউথ) পশ্চিমি প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া এবং নিজেদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে উঠে আসা, এটাকে ট্রাম্প একটি সংকেত মনে করছেন ।

ষষ্ঠ, আমেরিকাকে বাদ দিয়ে কোনো অপশ্চিমি গোষ্ঠীর উদয়কে ব্যক্তিগত ও দেশের অপমান হিসেবে দেখা হয়। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ব্রিকসের কার্যকলাপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং ব্রিকস দেশগুলির উপর অত্যধিক বাণিজ্য শুল্ক লাগানোর হুমকিও দেন। তিনি ব্রাজিলের উপর ৫০ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক লাগানোর ঘোষণা আগেই করে ফেলেছেন।

ভারতের বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ

ভারত নিজে ব্রিকসের সদস্য হলেও তার মনোভাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ভারসাম্যযুক্ত ও বাস্তবসম্মত। যার কারণে অন্যান্য ব্রিকস দেশগুলির থেকে ভারতের একটা পৃথক ভাবমূর্তি রয়েছে। ভারতের দৃষ্টিকোণ স্পষ্টভাবে তার জাতীয় কল্যাণে, রণনীতিগত স্বায়ত্ততা এবং ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত। যদিও ভারত টাকার মাধ্যমে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অন্যান্য আর্থিক চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং ডলারের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের আর্থিক কল্যাণের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা করে চলেছে। ভারত ডলারের বিরোধী নয়, কিন্তু বৈশ্বিক আর্থিক পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে, একক মুদ্রার উপর নির্ভরতা কমাতে এবং একটি বহুমুখী বিশ্ব ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রচণ্ড প্রচেষ্টার দরুন ডলারের উপর নির্ভরতা কম করার পক্ষে রয়েছে।

ভারত বিশ্ব বাণিজ্য ও আর্থিক বিষয়ে ডলারের প্রভুত্বকে বুঝতে পারে এবং তারা এর পূর্ণ প্রতিস্থাপনের (অন্য শব্দে, ডলার- বিমুদ্রীকরণ) আহ্বান করেনি। এর পরিবর্তে তারা গচ্ছিত মুদ্রার (ইউরো, ইউয়ান এবং সম্ভবত ভারতীয় টাকা) সহ-অস্তিত্বের পক্ষে।

ব্রিকসের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভারত এই গোষ্ঠীকে আমেরিকা বিরোধী গোষ্ঠীরূপে কখনোই দেখেনি, বরং ব্রিকস গোষ্ঠীকে বিশ্ব সংস্থার সংশোধনের জন্য উপযোগী একটি মঞ্চ হিসেবে দেখে। ভারত এমন একটি বিশ্বকে সমর্থন করে যেখানে একাধিক শক্তিকেন্দ্র হোক, যেখানে বৈশ্বিক দক্ষিণের সোচ্চার প্রতিনিধিত্ব হোক। ভারত দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো সংস্থার সংশোধনের দাবি জানাতে থাকে, যার বিষয়ে তাদের ধারণা হলো, এটি হলো পশ্চিমি প্রভুত্ববাদী এবং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতাকে প্রতিভাত করে না। এই প্রসঙ্গে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে বৈশ্বিক আর্থিক সংস্থানের সংশোধন নিয়ে একটি নথি তৈরি করতে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর সহ সঞ্চালক ছিলেন লরেন্স সমর্স এবং এন কে সিংহ। ভারত নিজ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ব্রিকসকে প্রযুক্তি, অর্থ, পরিকাঠামো এবং নিরন্তর বিকাশে সহযোগিতা প্রদানের জন্যই ব্যবহার করে, কোনোরকম আমেরিকা বিরোধিতার মধ্যে যায় না। আমেরিকা যদি ব্রিকসে চীনের অধিপত্য নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে, তবে ভারতও ব্রিকসের মধ্যে চীনের অধিপত্য নিয়ে সতর্ক থাকে এবং এমন যেকোনো গোষ্ঠী ব্যবহারকে অস্বীকার করে, যা কিনা তার সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে অথবা চীনের স্বার্থের কাছাকাছি হয়ে থাকে।

বৈশ্বিক স্তরে ভারতের ভারসাম্যযুক্ত দৃষ্টিকোণ দেশের উদ্দেশ্য পূর্তি এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্য প্রাপ্ত করা। ভারতীয় টাকার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি ছাড়াও ভারত ডলারের বিমুদ্রীকরণ রোধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ডিজিটাল টাকায় লেন-দেনে উৎসাহ দিয়ে ভারত পশ্চিমি লেন-দেন পদ্ধতির একছত্র অধিকারকে টেক্কা দিচ্ছে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে পৃথিবীতে প্রভুত্বস্থাপনকারী বলা সম্ভব নয়, বরং এই ব্যবস্থা অন্যকে ভারতের উপর প্রভাবী না হতে দিয়ে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য রয়েছে। অতীতে ভারত রাশিয়া ও ইরান থেকে তেল ক্রয় করে, ডিজিটাল লেন-দেনকে গুরুত্ব দিয়ে এবং বিশ্ব সংস্থাগুলিতে সংশোধন আনতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হয়ে নিজের শক্তির প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। মজার কথা হলো, এমনটা করাতে আমেরিকা ভারতের মধ্যে বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছে না এবং সম্ভবত ভারতকে চীন-সহ অন্যান্য দেশের প্রভুত্বকে ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি রূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

(লেখক দিল্লির পিজিডিএভি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সহ সংযোজক)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

শোক সংবাদ

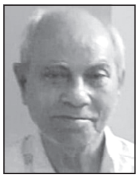

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুনীল আচার্য গত ২৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। বিজয়গড় এলাকায় সঙ্ঘকাজ বিস্তারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

বিশেষ ঘোষণা

স্বস্তিকার পাঠক-পাঠিকা, প্রচার প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, গত ৭৭ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বস্তিকা সাপ্তাহিক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু স্বস্তিকা পাঠে আগ্রহী বহু মানুষের কাছে ভাষাগত কারণে এটা সহজপাঠ্য হচ্ছিল না। ফলে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু স্বস্তিকাপ্রেমী স্বস্তিকাপাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। সেইসব হিন্দিভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ ও অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউণ্ডেসন-এর পক্ষ থেকে স্বস্তিকা-র হিন্দি সংস্করণও প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথির প্রাক্-লগ্নে আগামী ১৫ আগস্ট হিন্দি স্বস্তিকা (মাসিক) আত্মপ্রকাশ করবে। আপাতত মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। মূল্য ধার্য হয়েছে ৩০ টাকা।

আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পরামর্শ এই নতুন সংস্করণটির চলার পথকে সমৃদ্ধ করবে--- এটাই আন্তরিকভাবে কামনা করি।

প্রকাশক,
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্টেসন

পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ৬ লক্ষ আসন খালি থাকাটা কীসের সংকেত?

এই শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ঠিক কী কারণে ৬ লক্ষ আসন খালি যাবে সেই সংক্রান্ত আলোচনার জন্য আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা। ২০২০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে বর্তমানে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স তৈরি হয়েছে এবং সেটা বেশ কঠিন। যা হোম ইউনিভার্সিটি বাদে বাকি সবার (কলেজগুলির) পক্ষে পড়াতে গেলে প্রচুর বিনিয়োগ এবং সেরা শিক্ষক প্রয়োজন। সঙ্গে দরকার ভালো প্রযুক্তি ও শিক্ষাদানের উপযোগী পরিকাঠামো। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কলেজ শিক্ষক 'স্যাক্ট' (স্টেট এইডেড কলেজ টিচার) গ্রুপের। কোথাও তাঁদের মাইনে ২০, ০০০ টাকা বা তারও কম।

গ্র্যাজুয়েশন কোর্স বা স্নাতক স্তরের পড়াশোনার ধরন প্রথম বর্ষে পাশ কোর্সের মতো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে বেশ কঠিন। দিল্লি বা অন্যান্য জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতা অনুযায়ী সিলেবাসকে ছোটো করা হয়েছে। কিন্তু এখানে যারা কলকাতা বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনে রয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশ বহুদিন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে কতটা সিলেবাসের বোঝা ছাত্ররা নিতে পারবে সেটা তাঁরা জানেন না।

এবার আসা যাক প্র্যাকটিকাল এডুকেশন বা ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রণালীর বিষয়ে। কোন ল্যাব (পরীক্ষাগার) কীভাবে, কত টাকায়, কোথায় খুললে, কোন পরীক্ষা করানো যাবে সেই সম্পর্কেও ধারণা নেই বহু শিক্ষক ও অধ্যাপকের। যে জন্য প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার দিন, কোথায় সিট পড়বে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে পৌঁছাতে পারবে কিনা সেটা হয়ে ওঠে একটি বড়ো প্রশ্ন। আবার প্রশ্নপত্রে যদি কোনো প্রশ্ন ভুল হয় তবে সেই প্রশ্নটির উত্তর দানে প্রয়াসী ছাত্রদের ফুল মার্কস দেয় পৃথিবীর সব বিশ্ববিদ্যালয়। একমাত্র ব্যতিক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ ৯৯ শতাংশ অধ্যাপকের ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়ে না। এখানে অনেক সময় ছাত্রের নম্বর কাটা যায় শিক্ষকের ভুলে। মাঝে মাঝে অনেক দেরিতে পরীক্ষা হয়, কখনও পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। কিন্তু পরের সেমিস্টারের ক্লাস টেস্টের মতো পরীক্ষাগুলি তার জন্য পিছিয়ে যায় না। ক্লাস না হলে বা সেমিস্টারের সিলেবাস শেষ না হলেও পরীক্ষা হবেই। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কোনো একটি কলেজের বা একাধিক কলেজের শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। যদি মতিঝিল কলেজের শিক্ষক প্রশ্ন তৈরি করেন, বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রের পক্ষে তার উত্তর দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইচ্ছা করে কঠিন প্রশ্ন করা এদের অভ্যাস। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনেক শিক্ষক কোয়েশ্চেন ব্যাংক প্রকাশের কথা বলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনে থাকা রাজনৈতিক মানসিকতাসম্পন্ন অধ্যাপকরা সেই প্রস্তাব কানেই নেননি।

স্নাতক পাঠক্রমের চতুর্থ বর্ষে ভালো ফল করলে সরাসরি গবেষণা করা যায়। কিন্তু চার বছর পড়াশোনা করার পর বা উচ্চশিক্ষা শেষের পর চাকরি পাওয়ার প্রায় সব রাস্তা পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বন্ধ। কারণ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের স্কুলগুলিতে হয় ঘুষ দিয়ে চাকরি, নয়তো কপালে প্যারা টিচারের কাজ জোটে। কলেজে স্যাক্ট টিচারের কাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র রাস্তা— 'রেকমেন্ডেশন' বা সুপারিশ।

এছাড়াও একটি বিষয় রয়েছে। এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা অযোগ্য ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। রাজ্য সরকার চায় না সাধারণ মানুষ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হোক। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত নীতিই হয়তো রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ হওয়ার অন্যতম কারণ। রাজ্য সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং তার প্রয়োগ ঠিক হলে বাকি সব সমস্যার সমাধান হয়তো সম্ভব হতো। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে নতুনভাবে ভাবতে হবে এবং এই ৬ লক্ষ আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করাতে কলেজগুলিতে এমন কিছু পড়াতে হবে যে বিষয়ে পাশ করলে এই যুগে চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হাতে পয়সা কোথায়? 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে প্রতি বুথে ভোট কিনতে। ১, ১০,০০০ টাকা করে যাবে ক্লাবগুলির পুজো কমিটির হোমরাচোমরাদের জন্য। তাছাড়া রাজ্য সরকার যদি ৬ লক্ষ ছেলে-মেয়ের জন্য ভালো মানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে, তাহলে কোথায় যাবে রায়বাবু, রায়চৌধুরীবাবু, গুপ্তবাবু বা সিংজীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়? কোথায় চাকরি করবেন ড. সুরঞ্জন দাশ এবং তাঁর বামপন্থী বন্ধুরা? উচ্চশিক্ষা শেষে এইসব অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ের গবেষণা বা অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়ার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন সুরঞ্জন দাশ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের চাকরি। এই রাজ্যে তাই শিক্ষা শূন্যের দিকে।

বাঙ্গালি সমাজে আজ থেকে ৭০ বছর আগে মানুষের ৪-৫টা সন্তান হতো। তখন একটা পরিবারে ৬ ভাই বিয়ে করলে ৩ জন চাকরি করত। ৪০ বছর আগে একজন একটি পরিবার চালাতেন, কিন্তু তাঁর সন্তান থাকত দু'টি। কারণ সন্তানদের স্কুল বেসরকারি হলেও দ্বাদশ শ্রেণীর পরে সরকারি খরচে পড়াশোনার সুযোগ ছিল। এখন বাবা-মা দু'জনেই হয়তো চাকুরিজীবী, কিন্তু একজন সন্তান। এবার সেই সন্তানের উচ্চশিক্ষার পর গবেষণার ক্ষেত্রেও গ্যাঁটের কড়ি খরচা করতে হবে। আর সমাজের একটি বড়ো অংশ যদি চিন্তা করে ছেলে-মেয়ে ১৪ বছর হলেও পকেট কাটতে বেরিয়ে পড়বে এবং সংসারের আয় বাড়ানোর কাজে আসবে, তাহলে মজহবি মতে করুন ৪টে বিয়ে এবং আনুন ১৬ বাচ্চা।

উপসংহারে বলা যায় যে, যারা ভাবেন শুধুমাত্র অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পরিবর্তন করছে, তারা ভুল ভাবছেন। সমস্যা কিন্তু বহুমুখী। শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হওয়া একটি জাতির সার্বিক পতনকে ত্বরান্বিত করে। □

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি

ড. জিষ্ণু বসু

উনআশি-তম স্বাধীনতা দিবসে ভারতের অবস্থান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কোথায়? আরব, তুর্কি, মুঘল, ইংরেজ-সহ বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে পরাধীন থাকা একটি জাতি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা স্বাদ পেল। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গ আর পঞ্জাবের অবদান উল্লেখ করার মতো। মুক্তির মন্দির সোপানতলে বঙ্গ ও পঞ্জাবের যেসব মহাপ্রাণের বলিদান হয়েছিল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সেই আনন্দঘন দিনে সেই সব ঘরে ছিল শোকের ছায়া। দেশভাগের সেই ভয়ানক দিনে বঙ্গের বহু নারী নিজেদের সম্মান আর স্বামী-পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও নেতাজী সুভাষ বা ড. শ্যামাপ্রসাদের মতো দেশনেতার অভাবে বঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি।

যে 'নেহরু-লিয়াকত-চুক্তি'-র জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন, সেই চুক্তিই কালক্রমে উদ্বাস্তুদের জন্য কাল হলো। পাকিস্তান ওই চুক্তির পরে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি করতে থাকে, হিন্দুর পলায়ন বেড়ে যায়, সেই প্রবাহ আজও অব্যাহত। অন্যদিকে ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়া প্রায় সকল মুসলমান আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে। নবদ্বীপ, নদীয়ায় এমন বহু গ্রাম আজও দেখতে পাওয়া যাবে, কলকাতায় বহু পাড়া এইসব ফিরে আসা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ তৈরি করেছে। 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি'র উপর ভরসা করে ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের স্বাক্ষরপত্রে ভারত সই করল না। পাকিস্তানও করেনি। সেই জেনেভা কনভেনশনের ভাবনা থেকেই আজ ইউএনএইচসিআর তৈরি হয়েছে। ইউনাউটেড নেশনস হাইকমিশন ফর রিফিউজিস (UNHCR) সারা পৃথিবীর অসহায় উদ্বাস্তুর হিসাব রাখে। প্রয়োজনে অত্যাচারী দেশের থেকে জমি আদায় করে উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি দেশে অন্যদেশের কতজন উদ্বাস্তু আছেন তার হিসেব নিকেশও তারা রাখে। কিন্তু 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি'-র কুপ্রভাবে UNHCR-এর ওয়েবসাইটে বা তাদের হিসেবে ভারতে একজনও বাংলাদেশি বা পাকিস্তানি উদ্বাস্তু নেই। অথচ বাস্তবটা আমরা জানি কিন্তু সারা পৃথিবী জানে না।

এমন বহু সিদ্ধান্ত ভারতকে স্বাধীনতার পরেও 'সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব' বা 'কলোনিয়াল হ্যাঙ্গওভার' থেকে বের হতে পারেনি। 'লাইসেন্স রাজ' ভারতীয় অর্থনীতি আর শিল্পকে বৃদ্ধি পেতে অসহযোগিতা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার দায়িত্ব বামপন্থীদের হাতে সমর্পণ করেছিল। ফলে ইতিহাস ব্যাখ্যা বা পঠনের শিক্ষাক্রম থেকে স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুছে দেওয়া হয়। সরকারি অনুগ্রহে ধীরে ধীরে সংবাদমাধ্যম 'কালচারাল মার্কসিজমের' হাতে চলে যায়। যাঁদের ভাষায় ভারতীয় হওয়া বা হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগ আসলে 'কালচারাল হেজিমনি।' তাই পত্রপত্রিকা, বৈদ্যুতিন মাধ্যম হিন্দুধর্মকে নীচু দেখানো বা ভারতীয় হিসেবে হীনম্মন্যতা জনমানসে তৈরি করে। প্রশাসনে কেবল সাহেবদের গাত্রবর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কার্যপদ্ধতি দেশবাসীর প্রতি অবিশ্বাস বা লালফিতের বাঁধন এতটুও আলগা হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বদলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশি ভাবনাই স্থান পেয়েছিল।

কিন্তু গত একদশকের একটু বেশি সময়ে ভারতের কিছু মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। কোনো সম্ভ্রান্ত গজদন্ত মিনার থেকে নেমে আসা নয় বরং সাধারণ সমাজ থেকে নেতৃত্ব উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে মহামহিম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কলকাতায় বলেছিলেন, আজ আমি কলকাতায় রাস্তা মেরামতের কাজ করতে না এসে, আপনাদের সামনে বক্তৃতা করতে এসেছি। এটাই বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্নের ভারত।

বাঙ্গালি গৌরবের নামে এরাজ্যে নিপাট প্রাদেশিকতা ছড়ানো হচ্ছে। কলকাতায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বা রাজনৈতিক উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী তথাকথিত শিল্পী সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীরা ভারতের অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মানুষদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন।

ভারতের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক চিহ্ন মুছে গেছে বহু লড়াই, বহু সাধনার পরে। কাশ্মীরে আজ ৩৭০ ধারা বা অন্য বিশেষ অসাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ড. শ্যামাপ্রসাদ নিজের জীবন বলিদান করেছেন। আজ সারা দেশে তিন তালাকের মতো অমানবিক প্রথা দেশ থেকে বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে।

আজ ভারত এক অপ্রতিবোধ্য

ফঃ ২

বিশ্বশক্তি। ভারত আজ পৃথিবীর চতুর্থ আর্থিক শক্তি। বিমুদ্রীকরণ, ডিজিটালাইজেশন এবং জিএসটি এইসব সাহসী পদক্ষেপ আজকের শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। আজ একজন ডাববিক্রেতাও অনলাইন পেমেন্ট গ্রহণ করছেন। এই ভারত এক নতুন ভারত। আত্মনির্ভর ভারত, স্কিল ইন্ডিয়া, মেক-ইন-ইন্ডিয়া আর স্টার্টআপ ইন্ডিয়া-র মতো পদক্ষেপ দেশের মধ্যে বিশ্বমানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কেবল কৃষিপণ্য নয়, মেক-ইন-ইন্ডিয়ার উৎপাদন বিশ্ব বাজারে উন্নত প্রযুক্তির জন্য সমাদৃত হচ্ছে।

অপারেশন সিঁদুর আজ বিশ্বের সামরিক শক্তির জগতে ভারতের এক উজ্জ্বল স্থান এনে দিয়েছে। ভারত নিজের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সুদৃঢ় করতে শতকরা একশোভাগ সফল হয়েছে। এস-৪০০ এক এমন আয়রন ডোমের মতো আকাশ রক্ষা ব্যবস্থা যা বাইরের থেকে ছুটে আসা অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করেছে।

ভারত যেমন দেশের বাইরে থেকে বহু সমরাস্ত্র কিনেছে, তেমন অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র বানিয়েছে। ব্রহ্মসের মতো ক্ষেপণাস্ত্র আজ বিশ্বের সমরাস্ত্র বাজারে একটি বড়ো চাহিদা সৃষ্টি করেছে। ফিলিপিনসের মতো চীনের প্রত্যক্ষ শত্রুদেশ ভারত থেকে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র কেনার চুক্তি করেছে। ভারত আজ স্বদেশি প্রযুক্তির মাধ্যমে 'পারমাণবিক ডুবোজাহাজ' (নিউক্লিয়ার সাবমেরিন) তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। আজ ভারত আকাশের উপগ্রহকে ধ্বংস করার মতো ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রযুক্তি কেবল হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাছেই আছে।

এককালে ভারতকে বিশাল কিন্তু পুরাতন প্রযুক্তিযুক্ত সামরিকবাহিনী হিসেবে গণ্য করা হতো। তাই ভারতের জেতার ক্ষমতার বিষয়ে অনেক যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ সন্দিহান ছিলেন। আজ সকলের অলক্ষ্যে ভারত অত্যাধুনিক সামরিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে।

আজ এই অমিত শক্তিশালী ভারতবর্ষ এক পরিণত সামরিক অধিষ্ঠান। তাই আচরণও সিংহের মতো। ছোটো খরগোশের পিছনে সারাদিন ছোটার মতো অবস্থায় নেই। তবে দেশের নারীজাতির বা মায়েদের সিঁদুর কেউ মুছে দিলে তাদের পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে ভারত।

আজকের ভারতবর্ষে ৬০ কোটি যুবশক্তির ভাণ্ডার আছে। সারা পৃথিবীতে কোথাও এমন মানব সম্পদ নেই। সব থেকে বড়ো বিষয় এই যুবক-যুবতীরা কেবলমাত্র আমেরিকা বা ইউরোপে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন না। এই যুবক-যুবতীরা দেশকে জানতে চান, দেশের ঐতিহ্যের উপর ভরসা রাখেন। তাঁদের জীবনে যোগ আর আয়ুর্বেদের মতো স্বদেশি দিনচর্যা এসেছে। এই ভারত সত্যি সত্যি 'একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।' তাই এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বিদেশনীতির আজ খোলনলচে পালটে গেছে। ভারত আজ কোনো 'পাওয়ার ব্লক'-এর মুখাপেক্ষী নয়। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গেও এক সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেটা দাসখত নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারেন। ট্রাম্পের নৈশভোজে না গিয়ে তিনি নিজের ইচ্ছায় পুরীতে ভগবান শ্রীজগন্নাথের পদপ্রান্তে এসে বসতে পারেন। ভারত মধ্যপ্রাচ্যে সৌদিআরব-সহ বহু দেশের পুরাতন বন্ধু। কিন্তু আজকের ভারত ইজরায়েলের সঙ্গেও প্রযুক্তিগত বা অন্য অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকী তথাকথিত শত্রুদেশ চীনের সঙ্গেও বহু ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে। এই রকম সর্বস্পর্শী এক বিদেশ নীতি যে দেশের থাকে তাকে কোনো দেশ চাইলেই হাত মোচড়াতে পারবে না। এই ভারত আগে আত্মপ্রকাশ করেনি।

ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। সারা পৃথিবীর হিসেবে বহুদলীয় গণতন্ত্র। দীর্ঘ আট দশক ধরে যা কেবল ভারতবর্ষেই সফলভাবে স্থাপিত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময়ের কালো দিনগুলিকে বাদ দিলে, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে পালিত হয়েছে। আজ সারা পৃথিবী দেখেছে যে বিপদের সময়ে ভারতবর্ষের সংসদ দলমত ভুলে দেশের পক্ষে এক বার্তা নিয়ে বিদেশে যেতে পারেন, কথা বলতে পারেন। সেখানে হায়দরাবাদের আসাউদ্দিন ওয়েসি বা কোয়েম্বেটুরের শশী থারুর যোগ দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন। এই ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের অন্যতম কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

ভারতবর্ষ অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে, সাফল্যের সঙ্গে একের পর এক একটি বিপদ ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেছে। ঔপনিবেশিকতার কালিমা মুছে ফেলেছে প্রায়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য সর্বত্র দেশভাগের গ্লানি আজ কেবল ইতিহাস। আজও ভারতবর্ষে কিছু মানুষ দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না। কিন্তু রাত্রে খালি পেটে ঘুমোতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা গত ১০/১১ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তাই মানুষের দারিদ্র্যকে অস্ত্র বানিয়ে মাওবাদী বা অন্য জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ জঙ্গলে জঙ্গলে, বন্যগ্রামগুলিতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। নেপাল থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত যে রেডকরিডোর দশ বছর আগে প্রায় নিশ্ছিদ্র মনে হতো। আজ সেই করিডোর শতছিদ্র পোকায় কাটা। দান্তেওয়াড়াতে গিয়ে কয়েকশো জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীর অত্যাধুনিক ছাত্রবাস দেখে বোঝা যায় যে বুলেট বা রক্তে মুক্তি লেখা নেই, মুক্তি আছে শিক্ষায়, মুক্তি আছে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সহ্য করেছে, এতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, সনাতন দুঃখ ভোগ করে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।'

এই অপূর্ব সহিষ্ণুতা আর অটল জীবনীশক্তি আজ স্বাধীনতার এই অমৃতকালে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামীজী তাঁর দিব্যচক্ষে যে দৃশ্য দেখেছিলেন, আমাদের প্রাচীনা জননী পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি মহিমান্বিত হয়ে বিশ্বের সামনে প্রকাশিতা হচ্ছেন।

ভারতবর্ষের এই বিশ্বগুরুর আসলে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাধনাতে অন্তিম লড়াই সম্ভবত পূর্বভারতেই হবে। বিগত কয়েক বছর আগে মণিপুরে একান্ত দুঃখজনক ঘটনা আর তাকে অস্ত্র বানিয়ে কালচারাল মার্কসিজমের প্রবক্তাদের সক্রিয়তা, দেশবিরোধী শক্তির মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহ, ইভাঞ্জেলিকাল চার্চ সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতজুড়ে আবার স্কুল,

কলেজ, অফিস, বাজার সর্বত্র অস্থিরতা তৈরিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তিও আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছিল। ভারত এই মহাবিপদ থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ এই ভারত তৈরির যে শুভশক্তি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুদ্ধভূমি তৈরি হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অসহায় উদ্বাস্তুদের সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সিএএ)-এর মাধ্যমে গ্রামে, শহরে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় সম্মানজনক ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করার কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে আছে।

ঠিক তেমনই ভারতবর্ষ সচেতন হয়ে উঠেছে সাকিল আহমেদের মতো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের এই দেশে বসবাসের জন্য যারা ব্যবস্থা করছেন তাদের জন্য। সাকিল আহমেদ নদীয়ার করিমপুর থেকে নিজের ভোটার কার্ড বানিয়েছিল। তখন এরাজ্যে শাসনক্ষমতায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামফ্রন্ট সরকার। তারপর সাকিল আহমেদ খারিজি মাদ্রাসায় ঘুরে ঘুরে কৌসরের মতো মেয়েদের সংগ্রহ করে। ইতিমধ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়ে গেল। নতুন সরকার রাজ্যে ১০ হাজারের বেশি খারিজি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দিল। ফুলে ফেঁপে উঠল সিমুলিয়া মাদ্রাসার মতো ভয়ানক সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরগুলি। সাকিল আহমেদের মতো অনুপ্রবেশকারীরা হাতে জান্নাত পেয়ে গেল। সীমান্তবর্তী জেলগুলিতে তৈরি হতে থাকল একের পর এক স্লিপার সেল।

এই স্লিপার সেলগুলি মাওবাদীদের মাধ্যমে কাশ্মীরের মুজাহিদদের মধ্যস্থতার তালিবানদের কাছ থেকে ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বানানোর প্রযুক্তি আমদানি করল। কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি জানিয়েছিল যে মাওবাদীরা তালিবানদের কাছ থেকে আল্ট্রা হাই ফিকোন্সি এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস এবং রেডিয়ো কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ প্রযুক্তি এনেছে ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে। এরই ফলশ্রুতি ২০১৪ সালে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ।

তাই তামিলনাড়ু থেকে বিহার কোথাও সাকিল আহমেদদের স্থান দিতে কেউ রাজি নয়। ভোটার তালিকাতেও যেখানে যেখানে অনুপ্রবেশকারী ঢুকে আছে তা খুঁজে বের করতে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (SIR) করতে আগ্রহী সমগ্র দেশ। তাই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে আশ্রয় দেওয়া আর রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের বিতাড়ন আজ পূর্বক্ষেত্রে দেশের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের বর্তমান অস্থির অবস্থা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। সেদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টানরা অত্যাচারিত হলে স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মানুষ শান্ত থাকতে পারবেন না।

যেভাবে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে, তাতে ভারতের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে নির্বাচনের পরে নতুন সরকার যদি চীনকে অবাধে তিস্তা প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে দেয়, তাহলে উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে চীনের সামরিক ঘাঁটি তৈরি হতে পারে।

বাঙ্গালি গৌরবের নামে এরাজ্যে নিপাট প্রাদেশিকতা ছড়ানো হচ্ছে। কলকাতায় প্রকাশ্যে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বা রাজনৈতিক উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী তথাকথিত শিল্পী সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীরা ভারতের অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মানুষদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কেউ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। ধীরে ধীরে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রাদেশিকতার ভাবনা বিস্তার লাভ করবে।

এভাবে যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় তবে সবচেয়ে লাভবান হবে জেহাদি শক্তি। কারণ হিন্দু বাঙ্গালি এই অসম লড়াইয়ে একদম একা হয়ে যাবে। স্বাধীনতার ঠিক আগে কলকাতার নরসংহারের সময় হিন্দু বাঙ্গালির সঙ্গে ছিলেন রাজস্থানের হিন্দু, পঞ্জাবের হিন্দু এবং ওড়িশার হিন্দু। আজও হাওড়া বা ব্যারাকপুরে হিন্দুর উপরে আক্রমণ হলে বাঙ্গালি, বিহারি, উত্তর ভারতীয়, রাজস্থানি হিন্দুরা একযোগে প্রতিরোধ করেন। এই ঐক্যই হলো ওই ‘বাংলা’ নামে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদের আসল লক্ষ্য। হিন্দু বাঙ্গালিকে আলাদা করতে পারলে বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তাকে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে খাবে।

আজও হাওড়া বা ব্যারাকপুরে হিন্দুর উপরে আক্রমণ হলে বাঙ্গালি, বিহারি, উত্তর ভারতীয়, রাজস্থানি হিন্দুরা একযোগে প্রতিরোধ করেন। এই ঐক্যই হলো ওই ‘বাংলা’ নামে তৈরি হওয়া বিচ্ছিন্নতাবাদের আসল লক্ষ্য। হিন্দু বাঙ্গালিকে আলাদা করতে পারলে বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তাকে শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে খাবে।

তাই আজ স্বাধীনতা দিবসের সকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সারা ভারতের ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য এই পূর্বপ্রান্তে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে এবারেরই চূড়ান্ত লড়াই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য জাতীয়নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করতেন। সেদিনের সেই ভয়ানক সময়ের সঙ্গে আজকের পশ্চিমবঙ্গে অনেক মিল। সেই সময় ১৯৩৯ সালে ‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :

‘নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,

শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—

বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।’ □

দেশ রক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে চলেছে ভারতীয় নৌবাহিনী

দুর্গাপদ ঘোষ

তিন দিক সমুদ্রঘেরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় নৌবাহিনী। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নৌবাহিনীর নাম ১৯৩৪ সালে রাখা হয়— 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি'। এই বাহিনীর নামই স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তিত হয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই বাহিনী তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। তবে ভারতীয় নৌবাহিনীর জনক বলা হয়ে থাকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে। জলসীমায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনিই প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে নৌবাহিনী গঠন করেন। সেই বাহিনীর প্রধান ছিলেন কানহোজী আংরে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের বিভীষিকা ও গ্লানি হজম করে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত তথা স্বাধীন হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী গঠন করা হলেও ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তেমন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি এই বাহিনী। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন ভাইস অ্যাডমিরাল এমএস নন্দ একটি ইংরেজি সাময়িক পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তাহলে ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানের বৃহত্তম ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর করাচি-সহ সে দেশের নৌঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দেবে— '...if war were to break out again, the Indian Navy would carry its right into the enemy's biggest Port like Karachi'। তাঁর এই দৃপ্ত ঘোষণা করেন ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে ১৯৭১, ১৯৯৯ ও ২০২৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। তিনবারই ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন সব কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে যাতে পাকিস্তানের কালঘাম ছুটে যাবার উপক্রম হয়েছে। তিনবারই এই নৌবহর করাচি বন্দরকে নিশানা করে পাকিস্তানকে কার্যত অবরুদ্ধ করে রাখে।

১২ বছর কেটে গেলেও ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলে এই বাহিনীকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ তেমনভাবে দেখতে পাওয়া যায়নি। নেহরু মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন এদিকে নজর দেবার কথা তেমনভাবে ভাবেননি। ১৯৬২ সালে ভারতে চীনা আক্রমণের কেন্দ্র ছিল মুখ্যত ভারতের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকা। বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশ। কিন্তু ওই যুদ্ধ যদি জলসীমা পর্যন্ত গড়াত তাহলে ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকত কিনা তখনকার প্রেক্ষিতে এখনো সেটা একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও তৎকালীন ভারত সরকারের ঘুম ভাঙতে দেখা যায়নি। এরপর ১৯৬৪ সালের ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী হয়েই লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর স্বল্পকালের সরকারের আমলে স্থলবাহিনী যতটা শক্তিশালী করতে পেরেছিলেন বিমান ও নৌবাহিনীকে ততটা করে উঠতে পারেননি। বস্তুত সময়ও তেমন পাননি। অন্যদিকে আমেরিকার মদতে পাকিস্তান তাদের বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীকে তুলনামূলক ভাবে বেশ কিছুটা শক্তিশালী করে ফেলেছিল। পাকিস্তান মনে করেছিল ১৯৬২ সালের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে ভারতের আরও অনেক বেশি সময় লাগবে। পরিস্থিতি তাদের অনকূলে মনে করে যুদ্ধবাজ পাকিস্তান ১৯৬৫ সালে ফের হামলা চালিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

তারপর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রচেষ্টায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে পাক রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি তথা অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর তার পরদিনই তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। ওই যুদ্ধে ছাম্ব এলাকায় পাকিস্তান ভারতীয় স্থল বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হলেও তাদের নৌবাহিনী ৭-৮ সেপ্টেম্বর গুজরাট পর্যন্ত চলে আসতে সক্ষম হয় এবং দ্বারকা বন্দরে ছোটোখাটো হামলা চালায়। যদিও তাতে ভারতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল নিতান্ত নগণ্য। অতি সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে অবসরপ্রাপ্ত একজন পদস্থ নৌ-কর্তা রবি শর্মার এক বক্তব্যে।

শ্রী শর্মা আরও জানিয়েছেন যে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবহরের বৃহত্তম রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত মেরামতির জন্য ভারতের প্রধান নৌঘাঁটি বিশাখাপত্তনমের ডকইয়ার্ডে রাখা ছিল। ফলে নৌশক্তিতে ভারত কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই ঘাটতি কাটিয়ে এই বাহিনীকে সক্রিয় করে তোলার কাজ শুরু হয় ১৯৬৬ সাল থেকে। মাত্র বছর তিনেকের মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী এক্ষেত্রে যে বেশ ভালোরকম উন্নতি করেছে সেটা সম্ভবত পাকিস্তান ঠাহর করতে পারেনি। স্বভাবমতো পাকিস্তান ফের রণহুংকার চালিয়ে যেতে থাকে। আস্ফালন করে যেতে থাকে তাদের নৌশক্তির। এই প্রেক্ষিতেই ১৯৬৯ সালে ভারতের ওয়েস্টার্ন নেভাল কমান্ডের তৎকালীন প্রধান তথা ভাইস অ্যাডমিরাল নন্দ সরাসরি করাচি বন্দরের নাম করে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেন। ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনী তার প্রমাণও দেয়। সেই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরার আগে ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ এবং ২০২৫ সালে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযানের সময় এই নৌবাহিনীর ভূমিকা কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা যাক।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পোশাকি নাম হলো 'ইন্ডিয়ান নেভি'। এই নেভি এখন এতটাই শক্তিশালী যে সারা বিশ্বের সমস্ত দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে বর্তমানে তার স্থান হলো চতুর্থ। এখন প্রায় সমগ্র বিশ্বই ভারতীয় নৌবাহিনীকে রীতিমতো সমীহর চোখে দেখে। ১৯৭১ থেকেই পাকিস্তান এই বাহিনীর ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, অনেক উঁচু পাহাড়ি এলাকায়। তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং পাক সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মুশারফের ধারণা ছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর ভারত ওই যুদ্ধে কেবল পাহাড়ি এলাকাতেই সেনা মোতায়েন করবে। কিন্তু ৩ মে থেকে শুরু এবং ২৬ জুলাইয়ে সরকারিভাবে শেষ হওয়া ওই যুদ্ধের এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানকে কার্যত প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল।

প্রসঙ্গত, শত্রুপক্ষকে অবরুদ্ধ করাটা যুদ্ধের একটা অতি কার্যকরী কৌশল। প্রাচীনকাল থেকেই এই কৌশল চলে আসছে। প্রতিপক্ষ আগেকার দিনে একে অন্যকে দুর্গবন্দি করে রাখত। যাতে রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে রসদের অভাবে দুর্গবন্দিরা এক সময় দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে হয় যুদ্ধে অবতীর্ণ নয়তো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। কার্গিল যুদ্ধের সময় বাজপেয়ী সরকারও এই কৌশল নেয়। ভারতের পক্ষ থেকে ওই যুদ্ধের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন বিজয়'। পাশাপাশি ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন তলোয়ার'। কার্গিল যুদ্ধ জলসীমার ধারে-কাছে কিংবা উপকূল এলাকার কাছাকাছি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান তাদের সেনাবাহিনীর জন্য রসদ জোগান বিশেষ করে রণসম্ভার নিয়ে যাবার জন্য যানবাহন চালানোর তেল এবং খাদ্যসামগ্রী যাতে ঠিকমতো না দিতে পারে সেজন্য তাদের মূল সাপ্লাই লাইনের ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে নৌবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। যৌথভাবে ওই অভিযান চালিয়েছিল ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম নেভাল কমান্ড। উত্তর আরব সাগরের পথে, বিশেষ করে ইরানের হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসা-যাওয়াকারী পাকিস্তানের তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলো ছাড়াও তাদের নৌ-বাণিজ্য পথকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য ভারতীয় নৌবহর তখন আক্রমণাত্মক মেজাজে আরব সাগরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। মূল লক্ষ্য ছিল চাপে পড়ে গিয়ে পাকিস্তান যাতে কার্গিল থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর এই কৌশলগত ভূমিকায় মাকরান উপকূলে পাকিস্তানি তেলবাহী জাহাজগুলো বিপাকে পড়ে যায়। ভারতের এই কৌশলী অভিযানের জন্য পাকিস্তানের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতের পক্ষে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমানবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হলেও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে নামানোর দরকার পড়েনি। স্থলসেনার বীরত্বের পাশাপাশি নৌবাহিনীর দাপট পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল।

এ বছরের ৭ থেকে ৯ মে পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সরকার 'অপারেশন সিঁদুর' নামে যে অভিযান চালিয়েছে তাতে স্থলবাহিনীর বস্তুত তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রত্যাঘাতে প্রধান ভূমিকায় ছিল বিমানবাহিনী। কিন্তু কার্গিল যুদ্ধ বা 'অপারেশন বিজয়'-এর সময় স্থলবাহিনীর কাজ সহজ করার জন্য নৌবাহিনী যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তেমনি এবার 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়ও নিয়েছে। এই অভিযান খুব অল্পদিন আগের ঘটনা। এ সম্পর্কে সকলেই এখনও যথেষ্টভাবে ওয়াকিবহাল ও অবহিত। তাই বিস্তারিত বিবরণের তেমন প্রয়োজন আছে মনে হয় না। ২০০০ মেরিন কমান্ডো এবং ৫৮ হাজার ৩৫০ জন সক্রিয় নৌসেনার এই বাহিনীর একটা বড়ো অংশকে এবারও রীতিমতো আক্রমণাত্মকভাবে আরব সাগরে মোতায়েন করা হয়েছিল। যেমনটি করা হয়েছিল ১৯৭১ থেকে ১৯৯৯ সালে। প্রধান নিশানা ছিল করাচি বন্দর। বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'বিক্রমাদিত্য' এবং দূরপাল্লার সাবমেরিন 'সিন্ধুরক্ষক' ছাড়াও ভারতীয় নৌবহরে অন্যান্য রণতরী, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট ইত্যাদি-সহ মোট ৩৬ খানা যুদ্ধজাহাজ এবং একাধিক সাবমেরিন মোতায়েন করা হয়েছিল। সেগুলো দিনরাত আরব সাগর তোলপাড় করা ছাড়াও পাকিস্তানের উপকূল এলাকায় নিরন্তর নজরদারি চালাতে থাকে। এবারও লক্ষ্য ছিল সরবরাহ লাইন আটকে দিয়ে গোটা পাকিস্তানকে অবরোধ করে রাখা। এছাড়া করাচি নৌঘাঁটি থেকে কোনো রণতরী কিংবা কোনো সাবমেরিন যাতে বেরতে না

পারে সেটাও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। ৮ মে মাঝরাতের মধ্যেই করাচি বন্দরকে যাকে বলে অবরুদ্ধ করে ফেলে ভারতীয় নৌবাহিনী। ওই বন্দর ছাড়াও গোটা করাচি শহরকে নিশানা করে ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল এবং বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ থেকে ফাইটার বিমানগুলো যাতে কার্পেট বম্বিং করতে পারে তার পুরো ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছিল।

করাচির ওপর মিসাইল হামলার জন্য তৈরি ছিল ভারতের সাবমেরিনগুলোও। যুদ্ধজাহাজ থেকে এমনকী ব্রহ্মোস মিসাইল দাগার ব্যবস্থাও ছিল। তড়িঘড়ি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির কাতর আবেদন না এলে কিংবা পাকিস্তান আরও বেচাল আচরণ করলে বন্দর-সহ সিন্ধু প্রদেশের ওই রাজধানী শহরকে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর। সেইসঙ্গে ভারতের প্রধান নৌবন্দর বিশাখাপত্তনম থেকে বেশ কয়েকটা রণতরী এবং রসদবাহী জাহাজ নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল গুজরাটের রাজকোট বন্দরে। যাতে সেগুলো করাচিকে ঘিরে রাখা নৌবহরকে প্রয়োজনীয় রসদ জোগান দিয়ে যেতে পারে। ভারতীয় নৌবাহিনীর এইসব ভূমিকায় করাচি বন্দর থেকে পাক নৌবাহিনীর কোনো যুদ্ধ জাহাজ কিংবা সাবমেরিন বেরিয়ে আসতে পারেনি। ভারতের নৌকর্তারা ২৪ ঘণ্টার প্রতি পলে তাদের লোকেশন ট্র্যাক করে যাচ্ছিলেন।

পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো এবং পাক সেনাপ্রধান আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের জমানায় ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নামে। খান সেনাদের দমন-পীড়ন-অত্যাচার যখন সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন ভারত সরকার সেখানে সেনা অভিযান শুরু করে সে বছরের ৩ ডিসেম্বর। তার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে পরাজিত হয়ে পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে। ওই যুদ্ধে পাকিস্তান ও ভারত দু'পক্ষই স্থল, জল ও বায়ু সেনাবাহিনীর তিন শাখাকেই নামিয়েছিল। তখন পাক নৌবাহিনী ভারতের তুলনায় খুব বেশি দুর্বল ছিল না।

ভারতের কাছে বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত ছিল বটে অন্যদিকে পাকিস্তানি নৌবহরের বড়ো ভরসা ছিল দূরপাল্লার বড়ো সাবমেরিন পিএনএস গাজি। শুরু থেকেই তার লক্ষ্য ছিল বিক্রান্তকে টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তির পাশাপাশি রণকৌশল এত সুচারু ছিল যে পাকিস্তান বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৬ ডিসেম্বর পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। 'বিক্রান্ত' তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। তার মোট ৪টি বয়লারের মধ্যে প্রযুক্তিগত কারণে একটি বয়লার তখনও কার্যশীল ছিল না। তা সত্ত্বেও রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএইচ শর্মার নেতৃত্বাধীন ইস্টার্ন ফ্লিট-এর রণসজ্জায় বিক্রান্তকেই অগ্রণী ভূমিকায় রাখা হয়েছিল। তখন ভারতীয় নৌবাহিনীর কৌশল ছিল পাকিস্তানের রসদ সরবরাহ বিপর্যস্ত করা। তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো তো বটেই, রসদ বহনকারী অন্যান্য জলযানগুলোও যাতে করাচি থেকে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ দিক বেড় দিয়ে এসে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন্দরে সহজে না পৌঁছতে পারে। তাছাড়া ভারতীয় নৌবাহিনী সেবার করাচির ওপরও প্রচণ্ড আঘাত করেছিল।

ভারতের সেনা অভিযান শুরুর প্রথম দিনই অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর আইএনএস রাজপুত নামের এক যুদ্ধজাহাজ থেকে ছোঁড়া দুটো টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের নৌবহরের বৃহত্তম সাবমেরিন পিএনএস গাজিকে। ফলে যুদ্ধের শুরুতেই বড়ো ধাক্কা খায় পাকিস্তান। এর পরদিনই 'সি হক' এবং সাবমেরিন ধ্বংসী যুদ্ধবিমানগুলো বিক্রান্ত থেকে উড়ে গিয়ে লাগাতার বোমাবর্ষণ শুরু করে। লক্ষ্য ছিল চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মঙ্গলা ও চালনায় পাকিস্তানের রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত ও বিধ্বস্ত, বন্দর পরিকাঠামো ব্যাহত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। বিশেষ করে কক্সবাজারে বোমা বর্ষণের ফলে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ড প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। দারুণভাবে ব্যাহত হয় পাকিস্তানের সেনা মোতায়েন ও সরবরাহ ব্যবস্থা। বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ বিক্রান্তর যুদ্ধবিমানগুলো যেমন আকাশপথের দখল নিয়ে নিয়েছিল সেই সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় নৌবহরের অন্যান্য জাহাজ বিশেষ করে আইএনএস, বিয়াস (বিপাশা), আইএনএস ব্রহ্মপুত্র এবং আইএনএস কামোর্তা সমুদ্রের দখল নিয়ে বিক্রান্তর নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ করে ফেলেছিল।

ওই যুদ্ধের প্রায় মাঝখানে ৯-১০ ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবহরের এটি যুদ্ধজাহাজ পাকিস্তানের বেআইনি ধাড়িবাজি তথা কুকীর্তি ধরে (ইন্টারসেপ্ট করে) ফেলে। আইএনএস বিপাশা জানতে পারে আনওয়ার বক্, তথা আজুল হাসান মারু নামের বাণিজ্যতরীতে শ্রমিকের ছদ্মবেশে পাক সেনাদের কক্সবাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন বিরোধী। সঙ্গে সঙ্গে ওই পাক জাহাজকে আটক করে ১৮ জন খানসেনাকে নিজেদের কবজায় নিয়ে নেয় বিপাশার নৌসেনারা। এই ঘটনায় পাকিস্তান আরও বেশি বিপাকে পড়ে যায়। ইতিমধ্যে ভারতীয় নৌসেনা, বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসফ) জওয়ানরা মঙ্গলা, চালনা এবং খুলনায় প্রবল আক্রমণ শানায় । একাজে তাদের সহযোগিতা করেছিল আইএনএস পানভেল। অন্যদিকে ৪-৫ ডিসেম্বর 'অপারেশন পাইথন' (অজগর) অভিযান চালিয়ে করাচি বন্দরকে প্রায় তছনছ করে দেয়।

৯ ডিসেম্বর অপারেশন ট্রাইডেন্ট-এর মাধ্যমে করাচির ওপর ক্ষেপণাস্ত্রও বর্ষণ করে। ভারতীয় নৌবাহিনীর ওই অভিযানের ফলে প্রায় ৭ দিন ধরে জ্বলেছিল পাকিস্তানের ওই প্রধান নৌবন্দর। গোটা করাচি শহরটা ঘেরাবন্দি করে ফেলা হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর এই সমস্ত ভূমিকার কারণেও পাকিস্তানের রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। একদিকে পদাতিক ও বায়ুসেনার আক্রমণ, অন্যদিকে নৌবাহিনীর তৎপরতার কাছে নতি স্বীকার করে ১৬ ডিসেম্বর ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের লে: জে: জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে পাকিস্তানের লে: জে: একে নিয়াজি সরকারিভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় নৌবাহিনী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য আইএনএস বিয়াস এবং আইএনএস পানভেল-এর দুই নেভাল কমান্ডার যথাক্রমে সামন্ত এবং নরোনহা-কে মহাবীর চক্রে সম্মানিত করা হয়েছিল। □

বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন : পাকিস্তানি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চলমান ইতিহাসের একটি পর্যালোচনা

দেবজিৎ সরকার

বালোচিস্তান হলো অবিভক্ত ভারতবর্ষের একটি অঞ্চল, যার ইতিহাস বহু শতাব্দী প্রাচীন। এই অঞ্চলে রয়েছে শক্তিপীঠ মরুতীর্থ হিংলাজ। ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে এই অঞ্চলটি পারস্য, মুঘল ও ব্রিটিশদের মতো বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে বালোচিস্তানকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। বালোচিস্তানের অধিকাংশ এলাকা ছিল কালাত খানতের অধীনস্থ। 'কালাত খানত' (Khanate of Kalat) ছিল একটি দেশীয় রাজ্য। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশরা কালাত খানতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে বলা হয় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে কালাত একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে থাকবে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় বালোচ নেতৃত্ব পাকিস্তানে যোগদানে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনেই কালাতের শেষ শাসক মির আহমেদ ইয়ার খান বালোচিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতের গান্ধী-নেহরু কবলিত কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং অকারণ মুসলমান তোষণের জন্য ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বলপ্রয়োগ করে বালোচিস্তান দখল করে নেয়। এই ঘটনাই বালোচ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করে। ন্যায়সঙ্গত কারণেই বালোচরা মনে করে যে, তাদেরকে জোর করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের সময় 'কালাত' একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকার দাবি জানালেও পাকিস্তান তা মানেনি। নানা প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধ অঞ্চল হলো বালোচিস্তান। আরব সাগরের সমুদ্র উপকূল-সহ এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সোনা, তামা, কয়লা, ইউরেনিয়াম, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল ভাণ্ডার। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি এবং পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সেনা শাসকরা গত ৭৫ বছর ধরে বালোচিস্তান জুড়ে এই বিপুল সম্পদকে লুঠ করার কারণে সম্পদশালী হয়েও তার কোনো সুফল বালোচরা পায়নি। পাকিস্তান সরকার এই সম্পদ ব্যবহার করে পাক পঞ্জাবের উন্নয়ন করলেও বালোচিস্তানের স্থানীয় উন্নয়নে কোনো বিনিয়োগ করে না। ফলে বালোচিস্তানের বিভিন্ন অংশে না আছে স্কুল, না আছে হাসপাতাল। বালোচিস্তানের সম্পদের বিনিময়ে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের বিপুল উন্নয়ন হলেও বালোচিস্তান পড়ে থাকে অন্ধকারেই। এখানকার সম্পদ লুঠতরাজের কারণে স্থানীয় মানুষ দারিদ্র্যের জ্বালায় জর্জরিত, যুবসমাজ বেকারত্বের ফাঁসে আক্রান্ত। বালোচিস্তান প্রদেশের সরকার পাকিস্তান সরকার ও পাক সেনাবাহিনীর হাতের পুতুল মাত্র।

এর পাশাপাশি বালোচদের উপর চলছে সাংস্কৃতিক ও জাতিগত নিপীড়ন। বালোচরা তাঁদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করছে। পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থায় বালোচি ভাষা ও সংস্কৃতি অবহেলিত। স্বাধীনতাকামী বালোচ নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষের উপর দীর্ঘদিন ধরে চলছে ব্যাপক দমন-পীড়ন। বালোচিস্তান জুড়ে অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ। প্রতিদিন বেড়ে চলেছে এই মিসিং পার্সন্সের সংখ্যা। বহু মানুষকে হত্যা করে পুঁতে দেয় পাকসেনা। বালোচিস্তান জুড়ে এরকম অনেক গণকবরের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। বালোচ মেয়েদের উপর পাক সেনা এবং পাক পঞ্জাবি মুসলমানদের অমানুষিক, নারকীয় অত্যাচারের ঘটনায় শিউরে ওঠে সভ্যসমাজ।

বালোচিস্তানের জনগণ চায় তাদের নিজস্ব সরকার ও স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু কোনো বালোচ নেতা স্বাধীনতার দাবিতে মুখর হলে বা কোনো আন্দোলন গড়ে তুললেই পাকিস্তান সরকার তাদের গ্রেপ্তার করে। অনেককে অপহরণ করা হয়। কারান্তরালে তাঁদের উপর বীভৎস অত্যাচার চালানো হয়। অনেককেই হত্যা করা হয়। এইভাবে নানা প্রক্রিয়ায় বালোচ স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করে থাকে পাক সেনা। বিভিন্ন ভয়ংকর পন্থা অবলম্বন করেও বালোচ জন-আন্দোলন থামাতে পারেনি পাকিস্তান সরকার। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান জোর করে বালোচিস্তান দখল নেওয়ার পরেই ওই বছরই সংঘটিত হয় প্রথম বিদ্রোহ। পাকিস্তানের সঙ্গে জোরপূর্বক সংযুক্তীকরণের বিরুদ্ধে বালোচ নেতা প্রিন্স করিম খান গড়ে তোলেন প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই বিদ্রোহ দমন করে পাক সেনা। ১৯৫০ পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আয়ুব খানের শাসনকালে বালোচিস্তানের মানুষের উপর প্রবল নির্যাতন শুরু হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫৮-৫৯ সালে বালোচিস্তানে সংঘটিত হয় একটি জন-অভ্যুত্থান। জেহরি সম্প্রদায়ের শীর্ষনেতা নবাব নওরোজ খান জারাকজাইয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে বালোচিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তা দমন করে। ১৯৬০ সালে কারাবন্দি ৭ বালোচ বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে জেলবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন নবাব নওরোজ খান জারাকজাই। এরপর ১৯৭৩-৭৭ বালোচিস্তানে পুনরায় সংঘটিত হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সময়ে বালোচিস্তানে শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ গেরিলা যুদ্ধ। মির বালোচ মেঙ্গল ও খায়ের বকশ মারির নেতৃত্বে বালোচ গেরিলারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এই যুদ্ধে অগণিত বালোচ যোদ্ধা নিহত হয় এবং পাকিস্তান সরকার তার নিজের দেশের নিরস্ত্র বালোচ নাগরিকদের উপর বিমান হামলা চালায়।

২০০০ সালের পর থেকে বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ), বালোচিস্তান রিপাবলিকান আর্মি (বিআরএ) এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধারা বালোচিস্তান জুড়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছে। এছাড়াও, ড. তারাচাঁদ, ড. হুমা বালোচ, মির সালাহউদ্দিন মেঙ্গল এবং

> **ভারতের চোখে বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ডগত দাবি নয়, এটি শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটিয়ে একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই।**

ব্রাহমদাগ বুগতির মতো বালোচ নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চে বালোচিস্তানের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরছেন। সম্প্রতি বালোচিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে। এই আন্দোলন দমনে ব্যাপক সন্ত্রাসের রাস্তা নিয়েছে পাক সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। বালোচিস্তান জুড়ে চলছে মানবাধিকার লঙ্ঘন। কয়েক হাজার বালোচ ছাত্র, যুবককে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের গুমখুন ছাড়াও চলছে ফাঁসি ও বিচারবহির্ভূত হত্যা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার কারণে বহু মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। বালোচিস্তান জুড়ে চলছে মিডিয়া সেন্সরশিপ। সাংবাদিকদের উপর চলছে হামলা। বালোচিস্তানের কোনো খবর সম্প্রচারের উপর রয়েছে পাক সরকারের নিষেধাজ্ঞা। বালোচিস্তানে দীর্ঘদিন ধরেই কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। পাক সরকারের পক্ষ থেকে কণ্ঠরোধ করার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্তরে সমর্থন পাচ্ছে। বালোচিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মহল। পাকিস্তান সরকার ও পাক সেনাবাহিনীর ফ্রন্টিয়ার কোরের দ্বারা বালোচিস্তান জুড়ে ভয়াবহ প্রশাসনিক সন্ত্রাসের বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট। বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিছু ক্ষেত্রে সমর্থন করেছে তালিবান পরিচালিত আফগানিস্তান সরকার। বালোচিস্তানের ক্ষেত্রে পাক অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বালোচিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখ ড. মেহরাং বালোচকে গত ২২ মার্চ কারাবন্দি করে পাক প্রশাসন। গত ১৪ মে স্বাধীন 'রিপাবলিক অফ বালোচিস্তান' গঠনের কথা ঘোষণা করেন সেখানকার স্বাধীনতাকামীরা। পাকিস্তানের দখলমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ভারতের কাছে সরাসরি সাহায্য চাইতেও দ্বিধা করেনি ওই সশস্ত্র গোষ্ঠী। গত ১৫ মে, আকাশবাণীর বিশেষ প্রতিবেদনে 'স্বাধীন বালোচিস্তান' আন্দোলনের নেতা মির ইয়ার বালোচকে উদ্ধৃত করা হয়। সামাজিক মাধ্যমে তিনি 'রিপাবলিক অফ বালোচিস্তান'-নামক স্বাধীন দেশ, তার পতাকা ও জাতীয় সংগীত-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে স্বাধীন বালোচিস্তানকে স্বীকৃতিদানের দাবি রাখেন।

বর্তমানে বিদ্রোহের আগুনে পুড়ছে বালোচিস্তান। মুহুর্মুহু আক্রমণ শানিয়ে পাকিস্তানের সরকার ও সেনাকে নাজেহাল করছে বিএলএ নামক সশস্ত্র গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে গোটা এলাকার উপর থেকে রাশ আলগা হচ্ছে ইসলামাবাদের। গত ১১ মার্চ কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস ট্রেন হাইজ্যাক করে বালোচ মুক্তিযোদ্ধারা। ট্রেনটিতে ৫০০-রও বেশি যাত্রী ছিল, যাদের অধিকাংশই পাক সেনাকর্মী বলে সংবাদসূত্রের খবর। ট্রেনটি হাইজ্যাকের পর তাদের অনেককেই অপহরণ করে বালোচ স্বাধীনতাকামীরা। যদিও ২৬ জনকে বালোচ বিদ্রোহীরা পণবন্দি করেছে এবং তাদের মধ্যে ১৮ জন নিহত হয়েছে বলে জানায় পাক সেনাবাহিনী। গত ৩০ মে বিএলএ-র অতর্কিত হামলায় হাতছাড়া হলো আস্ত একটা শহর। বালোচিস্তানের সুরাব শহর কবজা করার কথা প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেয় বিএলএ। এরপরই সমাজমাধ্যমে সেখানকার একাধিক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। তাতে সুরাবের বেশ কয়েকটি সরকারি ভবন এবং থানা থেকে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া বিএলএ যোদ্ধাদের হাতিয়ার হাতে শহরের মধ্যে টহল দেওয়ার ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে। বিএলএ-র জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মুক্তিযোদ্ধারা সুরাব শহরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংক, থানা ও সরকারি ভবন কবজা করেছে তারা। এলাকা পুনর্দখলে পাক ফৌজ যাতে সেখানে ঢুকতে না পারে তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে আটকেছে তাঁরা। বালোচিস্তানের ওই এলাকার কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। সুরাব থেকে বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার দূরত্ব প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। এই শহরের উপর থেকে গিয়েছে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা— কোয়েটা-করাচি এবং সুরাব-গিদার মহাসড়ক। বিএলএ-র দাবি, এই দু'টি রাস্তায় টহল দিচ্ছে বিদ্রোহীরা। রাস্তাগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্রোহী কমান্ডারেরা জানিয়েছে যে, সুরাবে হামলা চালানোর সময় স্থানীয় পুলিশ ও আধাসেনা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাঁড়াশি আক্রমণে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সমাজমাধ্যমে এই ঘটনার যে ভিডিয়োগুলি ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে অবশ্য এলাকাবাসীকে আতঙ্কে কুঁকড়ে যেতে দেখা যায়নি। উলটে বিএলএ যোদ্ধাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁরা। বিদ্রোহীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে স্থানীয়দের অনেকেই সেলফি তোলেন। বিশ্লেষকদের দাবি, পাকিস্তানের থেকে আলাদা হতে বালোচরা যে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে, এই ঘটনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শহরটিকে পুনর্দখল করতে ফ্রন্টিয়ার কোরকে পাঠিয়েছে রাওয়ালপিন্ডির সেনাকর্তারা। গত ৬ মে বোলান ও কেচ জেলায় পাক সেনার কনভয়ে হামলা চালা বিএলএ। গত ৯ মে বালোচিস্তানের কালাত জেলার মাঙ্গোচর এলাকা দখলের কথা জানিয়েছিল বিএলএ। কালাতের ৩৯টি স্থানে পাক ফৌজের উপর হামলা চালায় বিএলএ-র ফতেহ স্কোয়াড। একই দিনে ডেরা বুগতি জেলায় একটি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে হামাল চালিয়ে গ্যাস পাইপলাইন উড়িয়ে দেয় বিএলএ। বিশ্লেষকদের দাবি, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাক সংঘাতের আবহে স্বাধীনতার লক্ষ্যে 'অপারেশন হেরফ ২.০' শুরু করেছে বিএলএ। গত ১০ মে বালোচিস্তানের খুজদার জেলার ওরনাচ ক্রস এলাকায় জাতীয় সড়কের দখল নেয় বিএলএ। খুজদারে সাফল্য পাওয়ার পর গত ১১ মে পাঞ্জগুরের নোকাবাদে অতর্কিতে হামলা করে পাক সেনাবাহিনীর একটি পোস্ট দখলের চেষ্টা করে তারা। বালোচিস্তানের এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির রয়েছে নিজস্ব গুপ্তচর বাহিনী। এ ব্যাপারে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকেও টেক্কা দিয়েছে বিএলএ-র গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। তবে পাকিস্তান থেকে বালোচিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মোটেই সহজ নয়। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই প্রদেশটির একাধিক গুপ্তঘাঁটিতে পাক ফৌজ পরমাণু হাতিয়ার সাজিয়ে রেখেছে বলে মনে করে বিশেষজ্ঞ মহল। এছাড়াও, বালোচিস্তানের সঙ্গে বেজিঙের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। এখানে 'চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর'-এর কাজ চালাচ্ছে চীন। এর জন্য কয়েকশো কোটি ডলার লগ্নি করেছে চীন। সংশ্লিষ্ট রাস্তাটির বড়ো অংশ বালোচিস্তানের মধ্য দিয়ে গদর বন্দরে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

ভারতের চোখে বালোচিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন শুধুমাত্র একটি ভূখণ্ডগত দাবি নয়, এটি শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটিয়ে একটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বালোচরা তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম করে চলেছে। ভয়াবহ পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের এই লড়াই ন্যায়সঙ্গত, কারণ কোনো জাতিকে জোর করে শাসন করার বা তাঁদের প্রাকৃতিক সম্পদ হতে তাঁদের বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। আন্তর্জাতিক মহলের উচিত বালোচিস্তানের মানুষের ন্যায্য দাবিকে সমর্থন করা এবং পাকিস্তান সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া। আশা করা যায় যে, বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয়, সমর ক্ষমতায় চতুর্থ স্থানের দাবিদার নতুন ভারত তার আত্মার আত্মীয়, মা হিংলাজেশ্বরীর আশীর্বাদধন্য বালোচ জনগণকে পাকিস্তানের অন্যায় কবজা থেকে বেরিয়ে এই লড়াইতে সর্বপ্রকার সদর্থক ভূমিকা নেবে। পাকিস্তান ছাড়া বালোচিস্তানের বড়ো অংশ রয়েছে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে। তাই তিনটি দেশ থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হতে হবে এই ভূখণ্ডটিকে। বালোচিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তা দান তাই ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের সামনে একটি কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

□

বাঙ্গালির এক মৃত্যুপরোয়ানা

পঞ্চাশের দশক। কলকাতার রাজপথ তখন গর্জে উঠেছিল শিক্ষকদের দাবিদাওয়ায়। শুধু শিক্ষক নয়, সমগ্র সমাজ সেদিন ঐক্যবদ্ধ ছিল। রিকশাওয়ালা দূর থেকে থেমে শিক্ষকদের প্রণাম করত, খাবারের দোকানদার নিজের হাতের রান্না করা খাবার পাঠাতেন তাঁদের কাছে। বাড়ির ছোটো ছেলেটাও বলত--- 'মা, মাস্টারমশাইদের কিছু দিও, ওনারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ গড়েন।' সেই সমাজ কোথায় হারিয়ে গেল?

আজ ৭০ বছর পরে— ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী রাস্তায়। কিন্তু চারপাশে শুধু নীরবতা— উলটে কটূকথা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ অহবেলা তাঁদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে। শ্রদ্ধা যেন আজ একটা 'মিম', অর্থাৎ খাঁচাবন্দি এক উপহাসের বস্তু। আমরা কি এতটাই বদলে গিয়েছি? নাকি আমাদের ভাঙা হয়েছে? এই রাজ্য সরকার খুব পরিকল্পনা করে আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে দিয়েছে। তারা চায়, ঘরের মেয়েটি সারাদিন রিল বানাক, সমাজ-সংসার নিয়ে তাদের ভাবার সময় না থাকুক। সরকারি অফিসার শুধু ঘুষের অঙ্ক গুনে যাক, সহকর্মীর ডি.এ. নিয়ে তাদের ভাবার সময় না থাকুক। সাধারণ মানুষ শুধু পাড়ার পুজোর ডিজে নিয়ে ভাবুক, পাশের জেলার সাম্প্রদায়িক আগুনের আঁচ তাদের মনে না পড়ুক। রাজ্যের এই শাসক দল ও সরকার চায়— সবাই শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবুক। আরজি করে অভয়া হত্যাকাণ্ডের পর তারা রাজ্যের মানুষকে উৎসবে ফেরার কথা বলে।

আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সহকর্মী, আমাদের শিক্ষক— কেউ যেন আমাদের স্পর্শ না করে। এভাবেই একে একে সবাই একা হয়ে যায়। কারুর ওপরে যখন আঘাত নেমে আসে, তখন কেউ আর থাকে পাশে। আমরাও থাকব না একে অন্যের পাশে— কারণ, আমাদের ভেতরকার মনুষ্যত্বটাই মুছে দিয়েছে এই জেহাদি তোষণকারী, লুম্পেন শাসক দল এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত চরম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য সরকার।

তাই এখনই পশ্চিমবঙ্গের সকলকে জেগে উঠতে হবে। সমাজের সার্বিক জাগরণ প্রয়োজন। সবাইকে আবার ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হতে হবে। নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে বাঁধন। সর্বত্র সংঘটিত করতে হবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। সমাজটাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সবাইকে বুঝতে হবে যে, এই সরকারটা শুধু রাজ্যের অর্থনীতির শত্রু নয়, এরা আমাদের আত্মার শত্রু। রাজ্যজুড়ে শাসক দল এবং তাদের এই সরকার এক অসহনীয় ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই জনবিরোধী সরকারটাকে সমূলে উপড়ে ফেলা তাই জরুরি। This satanic Government must be ended— not mended.

— **সৌরভ চক্রবর্তী,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজের প্রেস বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার আগের ৪০০ বছর পৃথিবীর অন্যতম শিল্প এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল, তা আজ ধ্বংসের মুখে। যে মুর্শিদাবাদ একসময় পৃথিবীর ১৫ শতাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, আজ তা পরিযায়ী শ্রমিক সাপ্লাই কেন্দ্র। যে কলকাতাকে আজ থেকে ৮০ বছর আগেও লন্ডনের সঙ্গে তুলনা করা হতো, তা আজ মরুভূমি। আর তাই আজ কোটি কোটি বাঙ্গালি পরিযায়ী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তারা আজ দিল্লি থেকে ক্যালির্ফোনিয়া বাসী। এমন অবস্থায় নতুন ভোট ব্যাংক তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের এনে অবৈধ পরিচয়পত্র তুলে দিচ্ছে। বাঙ্গালি অস্মিতার নামে যে বাঙ্গালিরা দশকের পর দশক সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁদের বিপদে ফেলছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের এমন অবস্থা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ, ডাক্তার, উকিল, অ্যাকাউন্টেন্ট, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক থেকে জরি শিল্পী, স্বর্ণ শিল্পী, ফিটার কার্পেন্টার, চাষি কারও জন্য কাজ নেই। বাঙ্গালি চাষিরা কাশ্মীরে আপেল কুড়োতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে পর্যন্ত, রাজ্যের এমন দুরবস্থা। এই অবস্থায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য একদল নকশাল পরিচালিত সংবাদমাধ্যম, পেটোয়া বুদ্ধিজীবী, চিরকুটে চাকরি পাওয়া শিক্ষক-অধ্যাপকদের নিয়ে মমতা ব্যানার্জি যেভাবে ভারতবিরোধী আন্দোলন করছেন, কাল উপরোক্ত সব পরিযায়ী শ্রমিক বিপদে পড়বেন।

মানুষ এবার সত্যি সত্যি বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা মুসলমানদের সঙ্গে প্রকৃত বাঙ্গালিদের উপর আক্রমণ করবে। প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজ (দিল্লি প্রান্ত) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছে, শুধুমাত্র ভোটে জেতার জন্য এই কোটি কোটি অসহায় বাঙ্গালিকে বিপদে ফেলবেন না।

—প্রবাসী বঙ্গীয় সমাজ,
দিল্লি প্রান্ত।
২৮.৭.২৫

আমাদের অতীত জানতে সংস্কৃত জানা একান্ত আবশ্যক

উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরাও আন্দোলন করেছিল। সেই জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের স্মরণীয় দিন। আমাদের দেশের সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। কংগ্রেসের কৃপায় তা আজ অবহেলিত। আমরা একটু চেষ্টা করলেই এর পরিবর্তন করতে পারি। আজ দেশে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার লোক উর্দু-আরবি ভাষায় কথা বলা লোকের থেকে অনেক কম। সংস্কৃত ভাষা না জানার কারণে আমরা অনেক মূল্যবান সম্পদ (জ্ঞান) হারিয়েছি। পশ্চিমি দেশের মানুষ যখন বনে জঙ্গলে ও গুহায় বাস করতো তখন হিন্দুরা চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত, অর্থশাস্ত্র, সংগীত ও

ফঃ ৩

বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছি। আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসতেন। দেশ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সম্পদ লুণ্ঠন করতেই পাঠান, মুঘল ও ইংরেজরা এসেছিল। আমাদের হিন্দু রাজাদের সেদিনের অনৈক্যের কারণে পাঠান, মুঘল ও ইংরেজরা আমাদের শাসক হয়েছিল। তারা তাদের প্রয়োজনে ভুলিয়ে দিয়েছে আমাদের অতীত, আমাদের ভাষা। আমাদের সংস্কৃতি। আমরা আলোহীন হয়ছি। অন্ধকারে পিছন থেকে আলো আসলেই পথ চলতে সুবিধা হয়। আর সামনে থেকে আলো আসলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই পিছন থেকে আলো আসাই হলো ইতিহাস। দেশের প্রকৃত ইতিহাস না জানার কারণেই আমাদের এতো সমস্যা।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

বাঙ্গালি ও বাংলাদেশির কীভাবে চিহ্নিতকরণ হবে

সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অর্থাৎ সিএএ পাশ হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে উত্তপ্ত, অসহিষ্ণু, হিংসার আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। কখনো 'ক্যা ক্যা-ছ্যা ছ্যা' শুনতে হয়েছিল, কখনো-বা অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয় দেখানো হয়েছিল মুসলমানদেরকে। মুসলমানরা বিজেপির ভয়ে জুজু হয়ে একচেটিয়া তৃণমূল ভোট দিয়েছিল। আগামী বছর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আবহাওয়া এখন থেকে বেশ উত্তপ্ত হচ্ছে সেই একই ইস্যু নিয়ে। তবে এখানে একটু ভিন্ন সুর আছে। সেবারে ছিল শুধু মুসলমানরা, এবারে হিন্দু, মুসলমান দুই-ই আছে। অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে গুজরাট, অসম, বিহার, ওড়িশায় বাঙ্গালিদেরকে নাকি ধরা হচ্ছে বাংলাদেশি ভেবে। তাদেরকে বাংলাদেশি ধরে নিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থা করা হচ্ছে এমন প্রচার করছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একই ভাষা বাংলা। সেক্ষেত্রে কে বাঙ্গালি আর কে বাংলাদেশি তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যায়। বাঙ্গালি কারা? যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা বাঙ্গালি বলে আমরা জানি। কিন্তু যারা পশ্চিমবঙ্গে বাস করে না কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলে তারা কারা? আবার যারা এই রাজ্যে বাস করে কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা বলে না তারা? পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাংলাদেশ বাংলা ভাষায় কথা বলে। তাই বাঙ্গালি ও বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয় বইকী।

সিএএ-তে কি বলা হয়েছে, যে সমস্ত হিন্দু নির্যাতনের কারণে আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে চলে আসছে ভারতে, সরকার তাদেরকে এদেশে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেবে কিন্তু অহিন্দু অর্থাৎ যারা মুসলমান প্রতিবেশী দেশ থেকে এদেশে আসছে তাদেরকে সেই দেশে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ সহজ কথায় যারা আমাদের দেশের নাগরিক নয় এমন মুসলমানদেরকে বাংলাদেশে ফেরানো হবে, সে রোহিঙ্গা হতে পারে কিংবা বাংলাদেশি মুসলমানও হতে পারে। এ নিয়ে আমাদের দেশের নাগরিকদের ভয়ের কোনো কারণ থাকতে পারে না। যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ, তারা কেন বাংলাদেশে যাবে? যে সমস্ত মুসলমানদের জন্মভূমি বাংলাদেশে, যারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে এদেশে এসেছে, সংশোধিত নতুন আইন অনুযায়ী তাদেরকে সেদেশে ফিরে যেতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদেরও নাগরিকত্ব আইন আছে এবং সংশোধনীর পর সেই আইন এবার বেশি করে কার্যকরী করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে রিলিজিয়ন স্টেট তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ। তারা মনে করে তাদের রিলিজিয়ন ডোমেইন ভালো থাকবে, এমন ভাবনা থেকে ভারত থেকে পৃথক হয়। কী এমন কারণে সেই রিলিজিয়ন ডোমেইন থেকে ছুটে আসছে তারা ভারতে? সেখানে কি সুখ মিলছে না? মজহব তাদের অন্ন দিতে পারছে না? কেউ তাদের সুখী, সুন্দর জীবন দান করতে পারে না, আল্লাও নয়, যত দিন না তাদের বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত হচ্ছে। তাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন বলেছেন, 'যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন সন্ত্রাস থাকবে'।

আমাদের রাজ্যে যতো মুখ্যমন্ত্রী— প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার পূর্বপুরুষ বাংলাদেশি এবং ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে। নাগরিকত্ব আইন ছিল এবং সেই আইন বলে তাঁরা এদেশের নাগরিক হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ ভাগ হয়েছিল। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে সেদেশে তাঁদের স্থান হয়নি। তাঁদের ইন্টেলিজেন্সি ফেল হয়েছিল বলে দেশ থেকে তাড়া খেয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিগত নির্বাচনের তিনি মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয় দেখিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করেছিলেন। এবার তিনি বাঙ্গালিদের খেপিয়ে তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা নাকি ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে হেনস্থা হচ্ছে, ভাষা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। মুসলমানরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দুধের গাই হয়ে উঠেছে। হিন্দু বাঙ্গালিরা কি সেই ফাঁদে পা দিয়ে চটি চাটা হয়ে উঠবে?

খুব স্বাভাবিকভাবে বাঙ্গালি আর বাংলাদেশের মুসলমানদের চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক নাগরিকেরও দায়িত্ব আছে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। মনে রাখতে হবে আমরা প্রত্যেকে দেশের নাগরিক এবং পাহারাদার দুই-ই।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

নিজের সম্পদে মেয়েদের অধিকার

সায়ন্তনী সরকার

আলমারির এক কোণে রাখা ছোট্ট পুঁটলি। তার মধ্যে রাখা সরু সোনার চেন। একজোড়া বালা। নকশা কাটা কানের দুল। এই হলো মধ্যবিত্ত গিন্নির সম্পত্তি। 'স্ত্রীধন' আপদে বিপদে যদি কাজে লাগে, তাই তুলে রাখা থাকে সেই সম্পদ। হঠাৎ প্রয়োজন হোক অথবা শেষ বয়সের সম্বল। 'স্ত্রীধন' আঁকড়ে কেটে গিয়েছে কত না জীবন। কেউ 'স্ত্রীধন' সম্পূর্ণ ভোগ করতে পেরেছেন। সময়ের নিয়মে তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর হয়েছে। কেউ-বা এর মানেই জানেন না। আবার 'স্ত্রীধন'-এর উপর অধিকার বুঝে নিতে আদলতের দরজায় ঘুরে ঘুরে কারও সময় ফুরিয়েছে।

'স্ত্রীধন' আসলে কী? এর উপর মেয়েদের অধিকারই-বা কতটা? ব্যাখ্যা করলেন আইনজীবী রুমানিয়া বাগচী ঘোষ। তাঁর কথায়, 'স্ত্রীধন' কথাটার মধ্যেই এর মানে স্পষ্ট। যা নারীর সম্পত্তি। যার উপর তার একান্ত অধিকার রয়েছে। নারীর স্ব-উপার্জিত সম্পত্তি। হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট, ১৯৫৬, সেকশন ১৪-এ স্ত্রীধন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু সাকসেশন আইনে খুব সুন্দরভাবে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর সুবিধা শুধুমাত্র হিন্দুরাই পাবেন। এখনো আমাদের পারিবারিক আইন সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। গোটা দেশে সমান পারিবারিক আইন তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এখনো তা হয়নি।

আইনজীবী জানালেন, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খুব জরুরি। যখন দেখা গেল সমাজে মেয়েদের মাথা উঁচু করা দরকার, তাদের পায়ের তলার জমি শক্ত করা দরকার, তখন এই আইন প্রণয়ন হলো। স্ত্রীধনের অধিকার দেওয়া হলো মেয়েদের। এর আওতায় কী কী রয়েছে? রুমানিয়া বললেন, যেকোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীধন হিসেবে গ্রাহ্য হবে। জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট হলো স্থাবর সম্পত্তি। যেগুলো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সারানো যায় না। আর গয়না, টাকা, বিয়েতে পাওয়া উপহার হলো অস্থাবর সম্পত্তি। যা এক জায়গা থেকে সরিয়ে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। এই দুটোর ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অধিকার

মেয়েদের দেওয়া হয়েছে।'

পণপ্রথা এখন ভারতীয় সমাজের এক ব্যাধিরই নামান্তর। যদিও পণও একপ্রকার স্ত্রীধন। তবে এই দুইয়ের মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে আইনে। আইনজীবী জানালেন, ১৯৮৬ সালের 'প্রতিভা পানি ভার্সেস সুরজ কুমার' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পণ এবং স্ত্রীধনের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। আদালত জানায়, বিয়ের সময় কোনো মেয়ে বাবা, মা, ভাই, দাদা, দিদি, বোনের থেকে যে উপহার পাচ্ছে তা স্ত্রীধন। শ্বশুর শাশুড়ির থেকে প্রাপ্ত উপহারও স্ত্রীধন বলেই বিবেচিত হয়। বিয়ের সময় যজ্ঞের যে আগুন জ্বালানো হয়, তার সামনে যদি কোনো উপহার মেয়েটিকে দেওয়া হয়, সেটাও স্ত্রীধন। প্রণাম করার পর আত্মীয়রা যে উপহার দিচ্ছেন, সেটাও স্ত্রীধন। এই 'স্ত্রীধন' স্বামী ও শ্বশুর, শাশুড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু স্ত্রী যদি কখনো তা ফেরত চান, তা ফিরিয়ে দিতে তাঁরা বাধ্য। এছাড়া কোনো মেয়ের নিজের উপার্জন সবসময়ই স্ত্রীধনের আওতায় পড়বে। পণ হিসেবে মেয়েকে যা দেওয়া হচ্ছে তা পড়বে স্ত্রীধন-এর আওতায়।

আইনত যেসব সম্পত্তি মেয়েদের হস্তান্তর করা হয়, তার উপর অধিকার প্রমাণ করতে বিশেষ সমস্যা হয় না। কিন্তু যে ধরনের 'স্ত্রীধন'-এর কোনো আইনি নথি নেই, সেক্ষেত্রে সমস্যা হয়। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন রুমানিয়া। 'জমি, বাড়ি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দলিলই তার প্রমাণ। কিন্তু বিয়ের সময় বাবা, মা, শ্বশুর অথবা কোনো আত্মীয় উপহার হিসেবে একটি মেয়েকে যে গয়না দিচ্ছেন, তার কোনো লিখিত তথ্য থাকে না। ফলে প্রয়োজনে সেটা যে তারই 'স্ত্রীধন', তা আদালতে প্রমাণ করা একটু কঠিন হয়ে যায়। অনেক সময় বিয়ের তারিখের আগের কোনো তারিখে যদি গয়নার দোকানের কোনো 'ক্যাশমেমো' মেয়েটি দেখাতে পারেন, তখন ধরে নেওয়া হয়, মেয়ের বিয়ের আগে তাঁর বাবা ওই গয়না বিয়ে উপলক্ষ্যেই কিনেছিলেন এবং তাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটা প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হবে।

২০০৫-এর সেপ্টেম্বরে হিন্দু সাকসেশন আইনে একটি সংশোধন হয়। সেখানে মেয়েদের আরও বেশি অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেটা কী? রুমানিয়া বলেন, '২০০৫ থেকে পিতৃপুরুষের সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার দেওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্ট জানায়, একজন মেয়ে বাবার সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাবে। তার আগে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু আদালত জানাল, বাবার সম্পত্তিতে সমান অধিকার পাবে মেয়েরাও। শুধু সম্পত্তির অধিকার পাওয়াই নয়, বাবা-মায়ের সব দায়িত্বও সমানভাবে মেয়েদের নেওয়ার কথা আইনেই রয়েছে।'

শুধু স্ত্রীধন ভোগ করা নয়, তা যাতে বংশপরম্পরায় সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌঁছয়, তার দিক নির্দেশও দেওয়া রয়েছে আইনে। কোনো মহিলার মৃত্যুর পর 'স্ত্রীধন'-এর কী হবে? আইনজীবীর কথায়, 'মহিলার সন্তান ও স্বামী বেঁচে থাকলে তাদের মধ্যে স্ত্রীধন সমানভাবে ভাগ হয়ে যাবে। আর কোনো মহিলা নিঃসন্তান হলে এবং স্বামী মারা গেলে কী হবে? আইনত যে সম্পত্তি মেয়েটিকে তাঁর বাবা দিয়েছিলেন, তা আবার বাবার পরিবারের কাছে বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত যাবে। আর যে সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রাপ্ত, সেগুলো ওই পরিবারের পরে প্রজন্মের কাছে ফেরত যাবে।' □

ডাউন সিনড্রোম ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

২১ মার্চ ওয়ার্ল্ড ডাউন 'সিনড্রোম ডে'। প্রতি বছর এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী এই রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ২১তম ক্রোমোজোমের ত্রিগুণ বা ট্রাইসোমি-র স্বতন্ত্রতাকে বোঝানো। ডাউন সিনড্রোম একটি জিনগত ত্রুটিজনিত জন্মগত অসুখ। সঠিক পরিচালনা এবং যত্ন এই অসুখে আক্রান্ত শিশুকে দিতে পারে স্বাভাবিক জীবন। এই রোগের উপসর্গগুলি হলো :

- চোখের দৃষ্টিতে সমস্যা থাকে। চোখের ওপরের পাতায় অনেকের স্প্যাস্ট থাকে। শিশুর নাক ও কানের আকার ছোটো হয়। শ্রবণশক্তিতে সমস্যা থাকে।
- ত্বক খুব রুক্ষ, খসখসে হয়। পায়ের আঙুলের মাঝের অংশে অনেকটা ফাঁক থাকে। বিশেষ করে বুড়ো আঙুল ও তার পাশের আঙুলের মাঝে হাত এবং পায়ের আকার এবং আঙুলও ছোটো হয়।
- থাইরয়েজের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে হাইপোথাইরয়েডিজম। যেটা ডাউন সিনড্রোমের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
- ঘন ঘন শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হয়। হার্টের সমস্যা থাকে। অন্ত্রের সমস্যা দেখা দেয়।

কেন হয় ডাউন সিনড্রোম

- বেশি বয়সে মা হলে বিশেষ করে ৩৫ বছর বয়সের পরে সন্তান নিলে সেই সন্তানের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। এছাড়া কোনো মায়ের আগে এমন বৈশিষ্ট্যের শিশু থাকলে পরেও ডাউন সিনড্রোম শিশুর জন্ম হতে পারে।
- আবার কিছু ক্ষেত্রে পরিবেশদূষণ, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি কারণেও এমন শিশুর জন্ম হতে পারে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

প্রতিরোধের উপায়

গর্ভাবস্থায় প্রথম ২৪ সপ্তাহের মধ্যে বেশি কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা রয়েছে যার মাধ্যমে ডাউন সিনড্রোম শনাক্ত করা যায়। যেমন কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পেলিং, অ্যামনিওসেন্টেসিস ইত্যাদি টেস্টগুলো দশ থেকে পনেরো সপ্তাহের মধ্যে করানো যেতে পারে বিশেষজ্ঞর পরামর্শে। এছাড়া আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর নাকের হাড় দেখা, মায়ের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডাউন সিনড্রোমের উপস্থিতি নির্ণয়— এ সবের মাধ্যমে গর্ভের শিশুটির ডাউন সিনড্রোমে আছে কি না, তা সহজে যাচাই করা যায়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, গর্ভবতীরা তাঁদের গর্ভাবস্থায় খুব প্রাথমিক সময় থেকে যদি চিকিৎসকের কাছে যান, নির্দিষ্ট সময় অন্তর যদি সব পরীক্ষা করান, তাহলে গর্ভের পরিস্থিতি জানতে পারবেন সঠিক ভাবে। পরবর্তীতে গর্ভধারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে সেই দম্পতি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং অসুখ ধরা পড়লে ৯৭ শতাংশ প্রসূতি গর্ভপাত করিয়ে নেন। তবে এই পরীক্ষাগুলি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। তাই অনেকেই এড়িয়ে যেতে গিয়ে বিপদে পড়েন।

- জন্মের ৬ ও ১২ মাসের মাথায় এবং তারপর বছরে একবার করে শিশুর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করতে হবে। জন্মের ৬ মাসের মাথায় প্রথমবার এবং তারপর বছরে একবার থায়রয়েড প্রোফাইল চেক করতে হবে। ২ বছর বয়স থেকে প্রতি ৬ মাসের মাথায় প্রথমবার এবং তারপর বছরে একবার থায়রয়েড প্রোফাইল চেক করতে হবে। ২ বছর বয়স থেকে প্রতি ৬ মাসে একবার দাঁত পরীক্ষা জরুরি। ২-৩ বছরের মাথায় অন্ত্রের পরীক্ষা করা দরকার। ৩-৪ বছরের মাথায় জানতে হয়, শিশুর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। ৩-৫ বছরের মাথা, ঘাড়ের এক্সরে করে দেখে নিতে হবে।
- বিশেষজ্ঞদের মতে, সময়মতো পরিচর্যা ও চিকিৎসার মাধ্যমে শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। উপযুক্ত পরিবেশ ও বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো করতে পারলে ডাউন সিনড্রোম শিশু কর্মক্ষম হয়ে অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে।
- যেহেতু মায়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউন সিনড্রোম শিশু হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে, তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানে বেশি বয়স বিশেষ করে ৩৫-এর উপর যাদের বয়স তাঁদের মাতৃত্ব নেবার সময় খুব সতর্ক এবং সচেতন হতে বলা হয়। সবরকম পরীক্ষা করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়।
- কোনো মায়ের আগের বাচ্চা যদি ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত থাকে, তবে পরের বাচ্চা নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কীভাবে পরিচালনা করবেন

প্রথমত, হতাশ হবেন না। শারীরিকভাবে কোনো অঙ্গ প্রভাবিত না হলে এটি কোনো গুরুতর রোগ নয়। এই রোগীকে সহজেই পরিচালনা করা যেতে পারে। এই ধরনের শিশুদেরও আলাদা স্কুল আছে। এবং মানসিকভাবে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে তারা সাধারণ স্কুলেও ভর্তি হতে পারে এবং আর পাঁচজন বাচ্চার মতোই সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হয়, তাই পরিবার তথা বাবা ও মায়ের যত্ন ও উৎসাহ জরুরি। শিশুকে তার শারীরিক ও মানসিক বাধা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করতে প্রয়োজন একজন সঠিক ডাক্তারের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ। স্পিচ থেরাপি করান, যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে। স্পেশাল এডুকেশন এবং কাউন্সেলিং করাতে থাকুন, যাতে মানসিক রোগ শনাক্ত করা যায় এবং সময় মতো নিরাময় করা যায়। □

ক্ষমতা হস্তান্তর ১৫ আগস্ট এবং মধ্য রাত্রে কেন?

ডাঃ মধুসূদন পাল

কোনো কোনো মহল থেকে বলা হয়, ১৫ আগস্ট ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন। তাই ওই দিনটিকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস তো ভিন্ন কথা বলে!

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনিকদের বিচারের প্রতিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে শুরু হয় প্রবল আন্দোলন। এর অব্যবহিত পরে ১৯৪৬-এর প্রথমেই শুরু হলো তীব্র নৌবিদ্রোহ। পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে ব্রিটিশ অনুভব করে, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভাইসরয় ওয়াভেল ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কার্যকরী কোনো বোঝাপড়ায় আসতে ব্যর্থ হন। ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী এট্লি সিদ্ধান্ত নিলেন ওয়াভেলকে সরিয়ে ভারতবর্ষের নতুন ভাইসরয় হিসেবে মাউন্টব্যাটেনকে নিয়োগের। সেই অনুসারে মাউন্টব্যাটেন ইংল্যান্ড থেকে দিল্লি এসে পৌঁছালেন ২২ মার্চ ১৯৪৭। ভাইসরয় হিসেবে শপথ নিলেন ২৪ মার্চ।

১৫ জুলাই ১৯৪৭। ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে পাশ হলো 'ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিল'। হাউস অব লর্ডসে বিলটি পাশ হলো ১৬ জুলাই। একই সঙ্গে পরিবর্তন করা হলো 'দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫'। উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন স্থির হয়েছিল জুলাই ১৯৪৮। তাহলে, দিনটা কেন এগিয়ে আনা হলো?

উত্তর হলো, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা। মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষে পা রেখেই বুঝতে পারলেন পরিস্থিতি খুবই অগ্নিগর্ভ। তাছাড়া রয়েছে 'ডেড ঘোস্ট'-এর এদেশে আগমনের বাড়তি আশঙ্কা। তাই অস্বাভাবিক দ্রুততায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে মাউন্টব্যাটেনের ভারতবর্ষ ত্যাগের এই সিদ্ধান্ত। সেই অনুযায়ী পাকিস্তান ও ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঠিক হলো যথাক্রমে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭। ভারতের ক্ষেত্রে সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রে। ১৫ আগস্ট দিনটি নির্ধারণের উত্তর পাওয়া যাবে মাউন্টব্যাটেনের নিজের বক্তব্য থেকে। তিনি বলছেন,

"I knew it had to be soon. I hadn't worked it out exactly then— I thought it had to be about August or September and I then went to the 15th of August. Why? Because it was to the second anniversary of Japan's surrender. And I knew the thing was to have a date. And however much I consulted my staff, they would all give me different dates, later dates, and this ludicrously early date really put the cat among the canaries, frightened them all.'

(Mountbatten and the Partition of India-Lorry Collins & Dominique Lapierre. Pub. by Tarang Paper backs, a division of Vikas Publishing House Pvt. Ltd. Ghaziabad U.P. India, 1983, P-72)

অর্থাৎ 'আমি জানি এটা (ক্ষমতা হস্তান্তর) দ্রুত করতে হবে। তারপর ভাবলাম এটা হবে ১৫ আগস্ট। কেন? কারণ, এটা হলো জাপানের পরাজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী। প্রতিটি ঘটনার একটা দিন থাকে। যাইহোক, আমি আমার স্টাফদের সঙ্গে যতই আলোচনা করব, ততই ভিন্ন ভিন্ন দিনের কথা উঠবে। অমি তো চাই খুব শিঘ্রি একটা দিন। আমি একটা বিড়াল ছেড়ে দিলাম, যাতে সবাই সন্ত্রস্ত হয়।'

তৎকালীন অনেক গণ্যমান্য কংগ্রেস নেতা ১৫ আগস্ট দিনটি অশুভ বলে পরিবর্তনের অনুরোধ জানালেও মাউন্টব্যাটেন নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব মধ্য রাত্রিকে বেছে নেন। মধ্য রাত্রির অর্থ দিনটি ১৫ কিংবা ১৬ কোনোটিই নয়— শুভাশুভের উর্ধ্বে। মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের এই অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বার্ষিক সভা

গত ২৬-২৭ জুলাই অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ (স্কুল শিক্ষা)-এর রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই ফকিরদাস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২০০ শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র কাপুর এবং পূর্বক্ষেত্র সংগঠন প্রমুখ গোপাল পাঢ়ি। এছাড়াও ছিলেন রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক-সহ রাজ্যের অন্যান্য কার্যকর্তা। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাঁদের জেলার বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। অতপর বিগত বছরের কার্যসমীক্ষা, আগামী বছরের কর্মসূচি তৈরি, সংগঠনের আর্থিক স্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, রাজ্যব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে করণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়। করণিক, গ্রন্থাগারিক, পেনশনভোগী, পার্শ্বশিক্ষক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভার অন্তিম দিনে শ্রীকাপুর বলেন, বর্তমানে দেশের ২৮টি রাজ্যের হাজার হাজার বিদ্যালয় এবং শতাধিক মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন প্রসারিত হয়েছে। একথা গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে ভারতের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ। আগামী ১ সেপ্টেম্বর সারা দেশে ৫ লক্ষ বিদ্যালয়ে শপথবাক্য পাঠের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪ লক্ষ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তীর্থক্ষেত্র মনে করে কাজ করে চলেছেন।

তুহিনা প্রকাশনীর পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৭ জুলাই উত্তর কলকাতা-স্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আয়োজিত হয় তুহিনা প্রকাশনীর পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান। এদিন উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্নেহাংশু দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দ্রাণী বসু, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, রাসবিহারী গবেষক কল্যাণ চক্রবর্তী, লেখক ও রাজনীতিক সায়ন্তন বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সুখবর পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ। এরপর বক্তব্য রাখেন ড. সুকান্ত মজুমদার ও কল্যাণ চক্রবর্তী। এরপর সংগীত পরিবেশন করেন স্বামী স্তুতানন্দজী মহারাজ, আবৃত্তি করেন

শম্পা দত্ত। এরপর হয় সায়ন্তন বসু রচিত 'রাসবিহারী বোস : সাইক্লোনিক ফ্রিডম ফাইটার অফ গ্রেটার ইস্ট-এশিয়া' বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠান। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর উপর এটি তাঁর প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ। এছাড়া অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী তারাপদ লাহিড়ী রচিত— 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবন ও সংগ্রাম' বইটি এদিন পুনঃপ্রকাশিত হয়। বইটির মুখবন্ধ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত। এরপর রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্যের রেকর্ডেড ভাষণ মঞ্চ থেকে সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশে শোনানো হয়। তারপর বক্তব্য রাখেন ড. জিষ্ণু বসু, ইন্দ্রাণী বসু এবং সায়ন্তন বসু। শেষে সভাপতি হিসেবে ভাষণ দেন সুব্রত চাকী। তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তারা মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর স্মৃতিচারণ এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদানের কথা তাঁরা তুলে ধরেন। অজানা-অচেনা বিপ্লবীদের জীবনী সংক্রান্ত গবেষণার উপর তাঁরা বিশেষভাবে জোর দেন। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, বিপ্লবী দেবেশ কুমার কুণ্ডুর ভ্রাতুষ্পৌত্র সুবীর কুমার কুণ্ডু, বিপ্লবী হৃষিকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের কন্যা পূরবী সেন, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর ভ্রাতুষ্পুত্র পরিমল সেনগুপ্ত, বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পৌত্র অধীশ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার এবং তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশু মাইতি। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে তুহিনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন ড. সুমনচন্দ্র দাস। দেবাশিস ঘোষের কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাদপুরে দক্ষিণবঙ্গ গ্রামবিকাশ গতিবিধির প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ২৬-২৭ জুলাই দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত গ্রামবিকাশ গতিবিধির এক প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর সঙ্ঘ কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন গ্রাম বিকাশ গতিবিধির অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক শম্ভুপ্রসাদ গিরি, পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অশোক পাড়ি, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক দুলাল নস্কর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক তরুণ মুখোপাধ্যায়। বর্গে ৩০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সঙ্গের সহ প্রান্ত প্রচারক তরুণ মুখোপাধ্যায়। তিনি সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী কার্যক্রম এবং পঞ্চ পরিবর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক শম্ভুপ্রসাদ গিরি গ্রাম বিকাশের ৭টি আয়াম, পঞ্চশক্তি এবং গ্রামের ৭টি সম্পদের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। সাতটি আয়ামের মধ্যে সামজিক স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কার, সামাজিক সমরসতা, সামাজিক সুরক্ষা, গোআধারিত জৈব কৃষি, স্বাবলম্বী গ্রাম ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে পঞ্চশক্তির ভিত্তিতে গ্রামের বিকাশ কীভাবে করতে হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণের বিষয় কার্যকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন। গ্রাম স্বাবলম্বীকরণর জন্য আচার তৈরি, মাশরুম চাষ, মৌমাছি পালন, জৈব সার ও কীটনাশক তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গ্রামে আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখতে সকালে ভজন-কীর্তন সহ প্রভাতফেরিরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দুইদিনের প্রশিক্ষণের পর সকলেই উৎসাহ সহকারে নিজ নিজ স্থানে ফিরে যান।

সিউড়ীতে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে তারাশঙ্কর তর্পণ

গত ২৬ জুলাই বীরভূম জেলার সিউড়ী লিজ ক্লাবে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে তারাশঙ্কর তর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারপতি তথা সংস্থার সভাপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন অধ্যাপক নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক উমাশঙ্কর মালিক এবং বীরভূম জেলা গবেষক সুকুমার সিংহ। বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ স্মারক বক্তৃতা, কথায় ও গানে তারাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তারাশঙ্করের নাটকের পাঠাভিনয়। স্মারক বক্তৃতার বক্তা ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে সিউড়ী শহরের ২৫টি সাহিত্য ও নাট্যসংস্থার সদস্যরা উপস্থিত থেকে তারাশঙ্করের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। চার ঘণ্টার অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রযোজনা ও সম্পাদনা করেন ভারত

সরকারের প্রাক্তন বরিষ্ঠ গবেষক তথা তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ডঃ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর স্বাগত ভাষণে জানান, স্বাধীনতা অন্দোলনের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সিউড়ী জেলে বন্দি ছিলেন। তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজ জেলখানায় তারাশঙ্করের প্রতিকৃতি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশোধনাগার ও প্রশাসন বিভাগীয় মন্ত্রী এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে সহযেগিতার আশ্বাস দিয়ে এক পত্রে জানিয়েছেন এবারে তারাশঙ্করের মৃত্যুমাসে তা সম্ভব হবে। এবিষয়ে বীরভূম জেলা শাসক এবং জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুশান্ত রাহা।

মেদিনীপুর শহরে গ্রামশিখার উদ্যোগে 'সনাতন শ্রুতি'

গত ২৭ জুলাই মেদিনীপুর শহরের হবিবপুরে গ্রামশিখার উদ্যোগে 'সনাতন শ্রুতি'র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মেদিনীপুরের হিন্দুসমাজকে জাগ্রত ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে সনাতন দর্শনের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গীতাপাঠ ও আধ্যাত্মিক ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়। উপস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের শ্রীমদ্ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, মহানাম অঙ্গনের শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং ইসকনের শ্রীমদ্ জগদার্তিহা দাস প্রভু। অনুষ্ঠানে সনাতন ধর্ম, শাস্ত্রচর্চা এবং গীতাজ্ঞানের আলোকে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন এমন ৪৮৭ ভক্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ১টি করে গীতা ও অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। মেদিনীপুর শহরের বহু মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামশিখার সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং কার্যকর্তা পুলকেশ পণ্ডিত , ইন্দ্রজিৎ সামন্ত, অমিত পণ্ডিত, সঞ্জীব মল্লিক, কুহেলী দত্ত-সহ ৮নং ওয়ার্ডের যুবকবৃন্দ উপস্থিত থেকে সকলেকে আপ্যায়িত করেন।

INTO YOUR LIFE
SURYA
INTO YOUR LIFE, WE BRING LIGHT, WARMTH, & STRENGTH.
INTO YOUR LIFE, WE BRING SURYA ROSHNI.
Surya Roshni is the trusted companion bringing light, warmth, and care to every moment.
From purity in every sip to safe spaces, we bring innovation and reliability into your life.
Let's brighten up your world together!
Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting
I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya surya_roshni surya.roshni surya-roshni
Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

ফ ঃ ৪

ভারত সভার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই কলকাতায় অ্যালবার্ট হল সভাঘরে একত্রিত হয়েছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবগোপাল মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ বিশিষ্টজন। সেই সকালেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন এই সভার অন্যতম উদ্যোক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সভা থেকেই সেদিন জন্মগ্রহণ করে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা'। বিদেশি ব্যক্তি ও চিন্তাধারা-জারিত কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লিগের বিপ্রতীপে 'ভারত সভা' নামক এই মহাসম্মেলন হলো ভারতের মাটি হতে জন্ম নেওয়া প্রথম সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণে প্রায় ৬০০ জন উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালির উপস্থিতিতে স্থাপিত হয় ভারত সভা। প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আনন্দমোহন বসু। ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাণপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'বেঙ্গলি'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। যুক্ত হয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধ্য কলকাতায় ৬২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ভারত সভার অবস্থান।

গত ২৬ জুলাই সার্ধশতবর্ষে পদার্পণ করল ভারত সভা। অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে এদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস থেকে ভারত সভা হল পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রার আয়োজিত হয়। এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে ভারত সভার ১৫০ বছর উৎসবের সূচনা হয়। এক বছর ধরে এই উৎসব চলবে বলে জানান ভারত সভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানান যে, এই উৎসব উপলক্ষ্যে দুষ্প্রাপ্য লেখা ও ছবি সংবলিত স্মরণিকা প্রকাশিত হবে। এর পাশাপাশি থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবলিদানকারী বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ ও আলোচনাসভা। শোভাযাত্রা শেষে সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গোটা দিন জুড়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অনুষ্ঠানের পর হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান। এরপর অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনাসভা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারত সভার সভাপতি অধ্যাপক অনিল কুমার রায়, সহ-সভাপতি ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ, সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ও জহর সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক কুমারেশ চক্রবর্তী, সমাজকর্মী গোপা মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্টজন। সভায় সম্মানীয় অতিথি ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুরঞ্জন দাশ। আলোচনার বিষয় ছিল--- 'দেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সভার দায়িত্ব ও কর্তব্য'। বঙ্গপ্রদেশে ১২৪টি শাখা-সহ লক্ষ্ণৌ, মীরাট, লাহোর, সিন্ধু--- দেশজুড়ে অসংখ্য শাখার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারে ভারত সভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঙ্গে অসমে চা শ্রমিকদের আন্দোলন, ইলবার্ট বিল, রেলযাত্রীদের আন্দোলন, স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন-সহ একাধিক আন্দোলনে ভারত সভার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এ নেশন ইন মেকিং' বইটি এদিন পুনরায় প্রকাশ করে ভারত সভা। ১৫০ বছরের স্মরণিকাতে রয়েছে ২৫০-র বেশি দুষ্প্রাপ্য ছবি। রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক অ্যালবামের কিছু ছবিও। বিভিন্ন সময় ভারত সভায় পা রেখেছিলেন ভিভি গিরি, বেঙ্কট রমনের মতো ব্যক্তিত্ব। তাঁদের ছবি ও প্রবন্ধ রয়েছে এই স্মরণিকায়। বক্তারা জানান যে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারত সভা ১৫০ বছর ধরে যেভাবে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে, এই সময়ে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখা হবে সেই সব অবদান।

হুগলীর পাণ্ডুয়ায় স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কর্মশালা

গত ২৬, ২৭ জুলাই হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার পাঁচগড়ার হরিগুরু গোপাল চাঁদ ধামে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের দুই দিনের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ডঃ ধনপতরাম আগরওয়াল, অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ ধর্মেন্দ্র দুবে, পূর্বক্ষেত্রের সহক্ষেত্র সংযোজক অম্লান কুসুম

ঘোষ, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক ডাঃ দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, এনএএফইউবি-এর ডিরেক্টর গোপাল আচার্য এবং ভারত সরকারের খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন দপ্তরের আধিকারিক পবিত্র সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সমন্বয়ক শঙ্কর দয়াল মেহতা, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ— তিনবঙ্গের স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মহিলা প্রমুখ ডাঃ বাণী সরকার, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী নিবেদিতা পাল, সহ প্রান্ত সমন্বয়ক শ্রীমতী মৌমিতা মৃধা শীট হরিগুরু গোপাল চাঁদ ধামের সম্পাদক সজল গয়ালী, আর্যাপথের ডিরেক্টর ব্রহ্মজিৎ শীল, বিশিষ্ট শিল্পপতি দীপঙ্কর পাল। কর্মশালা শুরু হয় দেবকুমার বিশ্বাসের কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে। এরপর মঞ্চস্থ কার্যকর্তারা ভারতমাতা, দত্তোপন্থ ঠেংড়ী, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং বাবুগেনুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। কর্মশালায় ৬০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। শুরুতেই বক্তব্য রাখেন ডঃ আগরওয়াল। বক্তারা স্বদেশী অর্থনীতির এক-একটি দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হুগলী জেলা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সংযোজক গোবিন্দ গোপাল বিশ্বাস। সঞ্চালনায় ছিলেন স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ সম্পর্ক প্রমুখ মিলন খামারিয়া এবং তুহিন চক্রবর্তী।

জলগাঁওয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সমিতির বৈঠক

গত ১৯-২০ জুলাই মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সমিতির বৈঠক সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন ভাইয়াজী জোশী, অলোক কুমারজী, মিলিন্দজী-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় এবং ক্ষেত্রীয়, প্রান্তীয় কার্যকর্তারা। উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ দান করেন সন্ত শ্যামচৈতন্য মহারাজ এবং স্বামীনারায়ণ মন্দিরের পূজ্য আনন্দ প্রকাশ মহারাজ। দুদিনের এই বৈঠকে সংগঠনের এবং কার্যবিভাগের গত ৬ মাসের কাজের পর্যালোচনা করা হয়। আগামী দিনে কাজের বিস্তার ও আন্দোলন নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়— 'সংগঠিত ও শক্তিশালী হিন্দু সমাজই দেশবিরোধী চক্রান্ত বন্ধ করার একমাত্র সমাধান।' সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পঞ্চপরিবর্তন কার্যক্রম পরিষদের আগামী কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজের যোজনা করার বিষয়ে পথনির্দেশ করেন বিনায়কজী।

বৈঠকে কলকাতা ক্ষেত্রের ৫টি প্রান্ত থেকে ১৬ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এবার নবীন যোজনায় কলকাতা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সোহন সোলঙ্কি।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

সত্যানন্দ গুহ

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পুরাণ, উপনিষদ, মহাকাব্যবর্ণিত একই ব্যক্তি। '...ব্যাপার এই যে, যখন আধ্যাত্মিকতায় অনুপম এমন একজন আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে ঘিরে নানাপ্রকার পৌরাণিক কাহিনি রচিত হয়।' (স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ/প্রণব, শ্রাবণ-১৩৮৮)। মহর্ষি বৈশম্পায়ণ মহাভারতকে 'দ্যুতিমান ইতিহাস' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. বিমানবিহারী মজুমদার, ভাণ্ডারকর প্রমুখ মহাভারত তথা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' যথার্থ জবাব দিয়েছেন— 'মানব চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ইতিহাসবেত্তাও মানব চরিত্রের বর্ণনা করেন। ...সৌন্দর্য হেতু (কাব্যের বর্ণনা) ওই সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলে পরিত্যক্ত হয় নাই। মহাভারতও হতে পারে না।' অর্থাৎ মহাভারতের মূলকাহিনি ও শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বাস্তব।

সৌতি নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীগণকে ভারতবংশীয়দের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। তার আগেও অনেকে করেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ঐতিহাসিক বলেছেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করছেন না। আশ্চর্য ব্যাপার! শৌর্য, বীর্য, ঐশ্বর্য ও দেবসুলভ গুণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ খ্রিস্টজন্মের বহু আগে থেকেই দেবতা বলে পরিগণিত ও পূজিত। গ্রিক আগমনের আগেই তিনি অবতার রূপে স্বীকৃত। কাজেই গ্রিক মিথ থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনির জন্ম ও কথার কোনো যুক্তি ও প্রমাণ নেই।

রোমক ঐতিহাসিক কার্টিয়াস বলেছেন, আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পুরুরাজের রথের সম্মুখভাগে কৃষ্ণের মূর্তি (হেরাক্রিস) ছিল। আফগানিস্তানের ঐখনোমে খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কৃষ্ণ-বলরাম চিহ্নিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যের 'নিদ্দেস' গ্রন্থে (খ্রিঃপূঃ ৩য় শতক) বাসুদেব ও বলদেবের পূজক দুই সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া গেছে। জৈন কল্পসূত্রেও উল্লেখ আছে।

বায়ুপুরাণ, নানা খোদিত লিপি, মধ্যপ্রদেশের বেসনগরের গরুড় ধ্বজ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। ইন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীভগবানের গিরি গোবর্ধন লীলার মাধ্যমে দেবরাজ ইন্দ্রের দম্ভনাশ হলে মানুষ ইন্দ্রপূজার পরিবর্তে কৃষ্ণভজনা শুরু করে।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্ব এবং গোপী সমাচার

যোগেশ রায়ের মতে--- কৃষ্ণ সূর্যের প্রতিবিম্ব। গোপীরা তারকা। সূর্যরশ্মির জন্য তারকার দীপ্তি। কৃষ্ণের ব্রজলীলা সূর্যের লীলা।

ব্রজের রাখালরা গোপ-গোপী ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণ মতে কৃষ্ণের বালক্রীড়া রূপক। শ্রীমদ্ভাগবতমে উল্লেখিত পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন, কালীয়দমন, অরিষ্টাসুর বধ, গোবর্ধন গিরি ধারণ জ্যোতিষিক রূপক মাত্র (পৌরাণিক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)। ড. অতুল সুরও দেব-দেবীদের নক্ষত্রের রূপক বলে উল্লেখ করেছেন। দেবতা বলে কেউ নাকি ছিলেন না। 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' গ্রন্থে বলা হয়েছে--- ষোলোকলা চন্দ্রের প্রতি কলার অমিত জ্যোৎস্না উপলক্ষিত কৃষ্ণের ষোলো হাজার গোপিনী। গো অর্থ রশ্মি। কৃষ্ণের বাল্যকালের নাম গোপাল। গো দ্যুতিমূলক। সুতরাং গোপ-গোপিনী, গোচারণ- গোকুল-গোলোক শব্দগুলি দ্যুতিমূলক। সুফলদায়ী অষ্টমীর অর্ধঊন চন্দ্রে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ষোলোকলা চন্দ্রের অর্ধেক কৃষ্ণের রুক্মিনী প্রমুখ অষ্টসখী।

চন্দ্রের আরেক নাম মাধব (জ্যোৎস্না)। মাধবী পৃথিবী এবং মাধব চন্দ্রের পারস্পরিক আকর্ষণই রাধা ও কৃষ্ণের নিত্য বোধস্বরূপ মিলন— বিরহলীলার ভাগবত বিবৃতি। পার্থিক বর্ষচক্র পূর্ণিমার নাক্ষত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুরূপ কৃষ্ণের দোল-রাস-স্নানযাত্রা, পুষ্যাভিষেক, চন্দনযাত্রা ইত্যাদি কৃত্য দ্বারা চন্দ্রই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ— এই বেদোক্তির মর্যাদা রক্ষিত হয়। (প্রাচীন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মমোহন রায়ের লেখা থেকে সংগৃহীত)।

শিশির সেন লিখেছেন, ভাগবত পুরাণ মতে কৃষ্ণ ১১ বর্ষ গোকুলে ও বৃন্দাবনে কাটিয়েছেন। (৩-২-২৬)। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতেও ১১ বছর বয়স হলে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যান (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ৫৪ অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে বলা হয়েছে যে, কিশোর বয়সে কৃষ্ণ রাসনৃত্য করেছেন, তারপর বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যান।

মহাবিশ্বে রাশিচক্রে অনুরাধার আগে বিশাখা। যোগেশ বিদ্যানিধির মতে, বিশাখার পূর্বনাম 'রাধা'। 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' গ্রন্থে বিশাখার পূর্ব নাম ইন্দ্রাণী উল্লেখ আছে। তুলা ও বৃশ্চিক রাশি জুড়ে ১৬তম নক্ষত্র বিশাখার অবস্থান। বৃশ্চিক রাশিতে ১৭তম নক্ষত্র অনুরাধার অবস্থান। অনুরাধার অর্থ— 'রাধা অনুসৃত' বা 'অন্য রাধা'।

ভাগবতে রাধা ও সখীদের কথা নেই। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় জয়দ্রথ শ্রীকৃষ্ণের শত নিন্দা করেছেন, কিন্তু একবারও রাধা ও সখীদের কথা তুললেন না। কোনো অশ্লীল ইঙ্গিত করলেন না। অন্যদিকে 'হরিবংশ' ও পুরাণের গল্প বিবেচনা করলে রাধার যখন ২২-২৫ বছর বয়স, তখন কৃষ্ণের বয়স ৮-৯ বছর বয়স। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্বরাগ, উত্তররাগ, অভিসার, রাধাবিরহ, প্রেমবৈচিত্র ইত্যাদি অধ্যায়ে বা পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার উল্লেখ রয়েছে। শ্রীরাধিকা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। কোনো কোনো পণ্ডিতের অভিমত, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে ইরানের নিকটস্থ ('আভীর' জাতীয়) লৌকিক উপাখ্যান থেকে গোপীলীলা গড়ে উঠেছে। যোগেশ রায়, জ্যোতির্বিদ বেলাবাসিনী গুহ,

সুকুমার সেন প্রমুখ আকাশের নক্ষত্র পরিক্রমাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকার করেননি। মহাভারতের মতো জাতক গ্রন্থেও গোপীলীলার উল্লেখ নেই। ব্যাসদেবের পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্তভাবে এসব গল্প জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে— কৃষ্ণ ও কংসের বিরোধের উল্লেখ আছে, বৃন্দাবন লীলা নেই।

‘শ্রীবিষ্ণুকে গোপাল বা গাভীদের রক্ষক বলা হয়েছে। তিনি চিরকিশোর।’ —ঋগ্বেদ (১.২২.১৮/১.১৫৫.৬)।

ওড়িশায় শ্রীচৈতন্যদেবের অবস্থানকালে প্রাচীন কবি গোবিন্দ দাস বাবাজী বিরচিত ‘শ্রীচৈতন্য চকড়া’ বসুশ্রী সদাশিব রথশর্মা পুনরুদ্ধার করেন। মাইক্রোফিল্ম করে করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণ করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ গবেষক পণ্ডিত রথশর্মা স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজকে বাংলায় অনুবাদ করতে দেন। শিবানন্দজী কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করে বইটির প্রচার করেন। এই প্রতিবেদককে তিনি মহামূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটি উপহার দেন। পড়তে পড়তে যেন চক্ষু স্থির হয়ে যায়। ‘রাধাতত্ত্বে’ শ্রীরাধা বলে কি কেউ ছিলেন? রাধা কি পরবর্তী সংযোজন? শুধুই রোমান্টিক কাব্য?

মহাপ্রভু তাঁর উত্তর দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য চকড়ার ৭১-৭২ পাতার কথা হুবহু তুলে ধরা হলো।

একদিন মন্দিরে প্রবেশ করার সময় (কল্পতরু) বটবৃক্ষের মূলে প্রভু হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাগবতের বাণী কর্ণে প্রবেশ করল। প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বললেন, দেখ তো, কে ভাগবত পাঠ করছে? স্বরূপ বললেন, প্রভু, ইনি একজন উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথের নিজজন, নাম জগন্নাথ দাস। অটইনাথ মন্দিরের পুরনো পাণ্ডা, ভাগবতী ভাবরসের সারকথা সুন্দর করে বলেন। প্রভু বললেন, এই কল্পবৃক্ষের শাখাশ্রয়ে আমি বিশ্রাম করছি। তুমি ওই ব্রাহ্মণের কাছে যাও। ওর কাছে কিছু গুপ্ত বিষয় জানতে হবে। ওই ক্ষেত্র-দ্বিজপদ ভাগবতধ্যায়ীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে শ্রদ্ধাপূর্ণভাবে এই গুপ্ত কথাটি জিজ্ঞাসা করলেন? প্রশ্ন শুনে বিপ্র জগন্নাথ একটু হাসলেন। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশে প্রণাম করলেন। বললেন, উত্তম প্রশ্ন করলে, আমার হৃদয় কেঁপে উঠল। ভক্তিভরে জগন্নাথ দাস বদ্ধকর হলেন। কে তুমি! এ গুপ্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে?

কৃষ্ণ সাধ্য, এ জীব নিরন্তর সাধক। সাধনাই আরাধিতা রাধা। প্রেম ও ভাবের সার। রাধা প্রেমভাব সার। রাধা রমণীয় রাসেশ্বরী। কৃষ্ণ-মন্ত্রের উপাস্য। সেই বিদ্যা সকল যুগের বন্দনীয়। ‘কৃষ্ণ-বৃন্দারণ্যে’ বিরাজ করেন। বৃন্দারণ্য আর কিছু নয়, হৃদয়ের অনাহত চক্র। তার ভিতরে দিব্য জ্যোতির্ময়ী রাধা বিরাজ করছেন। তিনি পরাৎপরা, তিনি পূর্ণতমা। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখমণ্ডল। ভক্তি আর মুক্তি। তিনি নিত্য, তিনি মূল প্রকৃতি স্বরূপিণী পরা। মূলপ্রকৃতি আর পুরুষের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই, কোনো ভেদ নেই। একের অভাবে অন্যের কোনো সত্তা থাকে না। ‘রা’ বর্ণের তাৎপর্য হলো, সতত তিনি দান করেন আর ‘ধা’ বর্ণের তাৎপর্য তিনি নির্বাণও প্রদান করেন। এই শব্দের উচ্চারণমাত্রই মুক্তি হয়ে যায়। তাই তিনি রাধা বলে কথিত হন। তার মধ্যে যে ‘রেফ্’ মাত্রা আছে তিনি নিশ্চলভক্তির স্বরূপ। তাঁর লক্ষ্য হলো কৃষ্ণের চরণারবিন্দ। ‘ধ’ কার সহজাত্মিকা, তার তত্ত্ব হলো ‘হরি’ এই অক্ষয়দ্বয়। রাধা গুণাত্মিকা। কৃষ্ণ গুণবাচক বিগ্রহ। গুণাত্মিকার ‘মহাভাব’ প্রচ্ছন্ন থাকে।

সেই ভাবের দৃশ্য পরিণতিই কৃষ্ণ। রাধা কৃষ্ণাত্মিক। নিত্য কৃষ্ণ রাধাত্মক। কৃষ্ণের প্রাণের প্রাণ রাধা। সে রাধা ভাগবতের প্রাণ। প্রাণ শরীরের মধ্যে পরম সত্তা। তবু শরীরই দৃশ্য, প্রাণ অদৃশ্য, উহ্য। ভাগবতে তাই রাস রাসেশ্বরীর নামতত্ত্ব উহ্য আছে। তাই শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখারবিন্দ থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণ চরিতই প্রকটিত হয়েছে। যেমন, গোরা সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিগ্রহ কিন্তু রাধা ভাবান্বিত, তেমনি কৃষ্ণ চরিত ভাগবতে প্রকট, রাধা— বিরহিত। প্রেমী ও প্রেমাস্পদ জগতে অভেদ্য। কৃষ্ণলীলা মহাভাব, প্রেমের জন্যে জড়িত কিন্তু রাসেশ্বরী গুহ্য প্রেম অপ্রকট, ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রেম অকপট ভাব প্রকটিত। দক্ষিণ ভাব প্রকট, বাম ভাব লীলার স্বভাব। স্বভাবে মিশে থাকে। রাধা-নিধি, কৃষ্ণ চিন্তামণি। গুপ্ততম অনুভূতি অনুভবেই বোঝা যায়। যদি একবার ‘ভাগবতে’ রাধা নাম উল্লিখিত হতো তবে ভাগবতের নাম হতো ‘রাধা লীলামৃত’। গীত গোবিন্দের উদ্ধৃতি করে বলেছেন, ‘হরিমেক রসম্ চিরমপি বিহিত বিলাসম্’--- হরিই একমাত্র রস, ভক্তের চিরবিলাসের বস্তু। রসের আধার শ্রীরাধা, অপ্রকট অপ্রকাশ্য। প্রভু দূরে থেকে এই কথা শুনেছিলেন। অদ্ভুত হুংকার করে উঠলেন, আর ‘হা কৃষ্ণ’ বলে মূর্ছিত হয়ে গেলেন। বললেন, কে তুমি ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণ? মহাভাবের স্বরূপ বলে আমাকে শীতল করে দিলে? সেইদিন থেকে প্রতিদিন উভয়ের নিত্য-মিলন, নিত্য-আলিঙ্গন। সেই আলিঙ্গন ভাগবতের প্রতি প্রীতি।

‘ভাগবত প্রীতি’র উপরে জগন্নাথ বিপ্র পুনরায় বলেছেন, গোরা রায় শোন, জেনে রেখো শ্রীক্ষেত্রে রাধার পূজা নেই। রাধার হৃদয়গত ভাব, স্তম্ভস্বরূপে প্রতীয়মান রাধা অনাহত জ্যোতি ও প্রীতির প্রমাণ। রাধা আহ্লাদিনীময়ী শক্তি, কৃষ্ণের থেকে পৃথক নয়। কৃষ্ণের প্রীতি জ্যোতিরূপ এখানে চক্রের ভাব বহন করছেন আর সেই চক্র আর কিছু নয় রাসমণ্ডলের প্রতীক স্বয়ং সুদর্শন। রাধাষ্টমীর দিন তার আরাধনা হয়। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ অবস্থার পর শরীরে স্তম্ভাবস্থা প্রকট হয়। সেজন্যে সুদর্শন এই মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপে রয়েছেন। ‘বিভাব’ আর ‘ভাবে’র প্রতীক এই চক্র যার মধ্যে দিয়ে রতিভাব হৃদয়ে প্রকট হয়। সেই রসসার আস্বাদন তত্ত্ব ‘রাধাতত্ত্ব’। সেজন্যে রাধাষ্টমীর দিন এই প্রেম-স্তম্ভের ‘উৎসব যাত্রা’ আচরিত হয়। ‘বিভাব ব্যতিহি যেন যত্র বিভাবতে’র ন্যায় কৃষ্ণ বিভাব এ জগতে খ্যাত হয়। বিভাব নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু বিভেতি কখনো নষ্ট হয় না। রাধা আনন্দময়ী। সমস্ত আপদের বিনাশকারী। ‘যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’ বলে শ্রুতি প্রকাশ করেছেন। আনন্দময় ব্রহ্মই বিদ্বানের লক্ষ্য। ‘বিভেতি’র সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সেজন্য এই চক্র এখানে রামমণ্ডলে’র প্রতীকরূপে নারায়ণের বামে বিরাজ করছেন।

জগন্নাথের প্রেমময় শক্তি সুদর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত, আর সেই সুদর্শন রাধার প্রেমের স্বরূপ। সেজন্য রাধাষ্টমীতে তার তত্ত্ব চিন্তন হয়। —এইরকম নানা আলোচনা প্রত্যালোচনার ভেতরে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দাস এক মন হ’য়ে গেলেন।

কিছু পার্ষদ এই ঘটনাকে সহ্য করতে পারলেন না। উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের প্রতি প্রচুর প্রীতি তাদের অসহনীয় হলো। শ্রীচৈতন্য বললেন, ক্ষেত্রের এই ব্রাহ্মণ পরম ভাগবতী। জগন্নাথের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। রায় রামানন্দও তাঁর রাধাভাবের জন্য আমার অতি প্রিয়। □

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবন সাধনা অখণ্ড মাতৃভূমিকে সামনে রেখেই সিদ্ধিলাভ হয়েছে। অখণ্ড ভারতমাতাই ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্র। নিবেদিতার সাধনার অন্যতম দিক ছিল 'অখণ্ড ভারত'। নিবেদিতা এক জায়গায় তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'মাতৃভূমি ভারতবর্ষ বস্তুত অখণ্ড।

অখণ্ড ভারতের পূজারি শ্রীঅরবিন্দ

রাজদীপ মিশ্র

শুক্রবার ১ মে, ১৯০৮। "জানতাম না এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা। আমার সম্মুখে এক বছরের কারাবাস! এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যত বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হবে। এক বছরকাল মানবসমাজের বাইরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো থাকতে হবে। এবং আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করব, সেই পুরাতন পরিচিত মানুষটি প্রবেশ করবে না। একটি নতুন মানুষ, নতুন বুদ্ধি, নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে নতুন কর্মভার গ্রহণ করে আলিপুরস্থ আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসবে। বলেছি এক বছরের কারাবাস। বলা উচিত ছিল এক বছরের বনবাস, এক বছরের আশ্রমবাস। অনেকদিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্মে আসক্তি অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তা পারিনি। শেষে পরমদয়ালু সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সকল বাধার শত্রুকে এককোপে নিহত করে যোগাশ্রম দেখালেন। সেই আশ্রম ইংরেজের কারাগার। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল : আমি ভগবানকে পেলাম।"

এই অদ্ভুত বক্তব্য হলো আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষ্ণধন ঘোষ, তিনি বিলেতফেরত নামজাদা ডাক্তার। অরবিন্দের বয়স যখন পাঁচ বছর, তাঁকে তাঁর দুই ভাই বিনয়ভূষণ ও মনমোহনের সঙ্গে দার্জিলিং লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করা হলো। তিন ভাই দার্জিলিঙের সাহেবি স্কুলে আইরিশ নানদের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। দু' বছর পর ১৮৭৯ সালে তিন ছেলেকে বিলেত পাঠালেন বাবা। ম্যাঞ্চেস্টার শহরে পাদরি উইলিয়াম ড্রুয়েট ও তাঁর স্ত্রীর কাছে বাড়িতে বসেই অরবিন্দের প্রথম পাঠ শুরু। বয়স তখন মাত্র সাত। বাবার উদ্দেশ্য ছিল ছেলেরা নিখাত ব্রিটিশ তৈরি হোক। লন্ডনের সেরা স্কুল 'সেন্টপলস'-এ ভর্তি হলেন অরবিন্দ। অসামান্য মেধা। নিজের ক্লাস পেরিয়ে বড়োদের ক্লাসে ঢুকে পড়ল স্কলারশিপ পেয়ে। মূল ভাষায় পড়ছেন ভার্জিল, সিসেরো, ইউরিপিডিস। গ্রিক ভাষায় পড়ছেন, নিউ টেস্টামেন্ট। মাতৃভাষার মতো শিখে ফেলেছে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ। স্কুল পাঠ শেষে বৃত্তি পেয়ে ভর্তি হন কেমব্রিজের কিংস কলেজে। এক বছরে কলেজের গ্রিক ও ল্যাটিনের সমস্ত পুরস্কার পেলেন। দ্বিতীয় বছরে ট্রাইপস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন।

বাবা কৃষ্ণধন আদবকায়দায় সাহেব হলেও তাঁর মনটি ছিল খাঁটি ভারতীয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের অত্যাচারের যেসব খবর, 'বেঙ্গলি' সংবাদপত্রে বেরোত সেগুলি তিনি তরুণ অরবিন্দকে পাঠাতে শুরু করলেন। কেমব্রিজে 'ইন্ডিয়ান মজলিশ' বলে একটি সভা ছিল। সেখানে তিনি বিপ্লবের কথা, স্বাধীনতার কথা দৃপ্তকণ্ঠে বলতেন, একটির পর একটি ভাষণে তিনি ইংরেজদের মুখের ওপর বলতে লাগলেন— 'তোমরা সারা বিশ্বে এমন একটা ভান দেখাও, যেন তোমাদের মতো ভদ্রলোক আর নেই। সমস্ত ব্যাপারেই তোমাদের রায় সুবিচারের পক্ষে। কিন্তু এতবড়ো মিথ্যা আর কোথায় পাব?' আবার একদিন তিনি বলেন, 'তোমাদের গ্ল্যাডস্টোন পার্লামেন্টে যা কিছু করেন, যা কিছু বলেন তার মধ্যে

কোনো উচ্চাদর্শ তো নেই-ই, তিনি ভেতরে ভেতরে সারাক্ষণ ভারতের ক্ষতি করে যাচ্ছেন।' ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করল অরবিন্দই ইংরেজের সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু— 'The most dangerous Indian.'

বাবার ইচ্ছানুসারে ১৮৯০ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে আইসিএস পরীক্ষায় ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় রেকর্ড নম্বর নিয়ে প্রথম হলেন। কিন্তু হাকিম হয়ে ইংরেজের গোলামি করতে তাঁর মন চাইল না। কিন্তু বাবার মনে দুঃখও দিতে চাইলেন না। তাই সিভিল সার্ভিসে শিক্ষানবিশ হলেন কিন্তু ইচ্ছে করেই ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষাতে হাজির হলেন না।

বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোওয়াড় তখন বিলেতে। অরবিন্দের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ কাজে নিয়োগ করে দেশে ফিরতে বলেন। দেশে ফিরে কাজ করতে করতে বাংলা, সংস্কৃত, গুজরাটি, মরাঠি শিখলেন। একে একে গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য শাস্ত্র, কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য পড়লেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, 'আমাদের শত্রু বাইরের কেউ নয়, নিজেদের ভীরুতা ও দুর্বলতাই আমাদের শত্রু।'

অরবিন্দ তখন বরোদা স্টেট সার্ভিসের রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। এমন সময় ১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে বঙ্গের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে চারদিক কেঁপে উঠল। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত অকাল রাখিবন্ধনে সবাই মেতে উঠল, মুখে সবার 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান জাতীয় পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষার জন্য তখন গঠিত হয়েছে জাতীয় কলেজ। বরোদার ৭৫০ টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে বরোদা স্টেট কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনার কাজে নিজেকে যুক্ত করলেন তিনি, পরে ওই কলেজের উপাচার্য পদ অলংকৃত করেন। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলতেন— 'তোমরা লেখাপড়া শিখবে দেশের জন্য। দেশের জন্যই তোমরা তোমাদের দেহ, মন গঠন করবে। তোমরা অর্থ উপার্জন করবে দেশসেবার জন্য দেহধারণ করতে। তোমরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাবে যাতে উন্নত জ্ঞান আহরণ করে দেশের উন্নতি করতে পার। সর্বদা এমন কাজ করবে যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তোমার সকল কর্মের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের কল্যাণ।'

অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ সকলের অগোচরে সাধনা শুরু করলেন। কিন্তু ভাস্কর লেলে নামে এক মরাঠি যোগীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। লেলের সঙ্গে তিনি তিনদিন ধ্যানে মগ্ন থাকলেন। সেই যোগী শ্রীঅরবিন্দের একাগ্রতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শেষে একদিন তিনি বললেন, 'এখন থেকে ভগবানই তোমাকে চালিয়ে নেবেন। ভগবানই তোমার গুরু হবেন। তোমাকে আর আমার কিছু জানাবার নেই।' এই সময়েই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু সংসারধর্মে ছিলেন চির উদাসীন। দেশমাতৃতার মুক্তি সংগ্রামের ভাব অরবিন্দকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসে। তিনি হয়ে উঠলেন জাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক, অখণ্ড ভারতের সাধক তথা একজন পরিপূর্ণ মানব।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি যোগ দিলেন। পুলিশ এই সভা ভেঙে দিল। ফলত, অরবিন্দ বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে সভাসমিতিতে ভাষণ দিতে

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001
Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in
Fax : 91-33-22202260
GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

থাকলেন। অনুজ বারীন ঘোষের প্রস্তাবে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকা বের করলেন যাতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের কথা এবং গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখা হতো। বিপিনচন্দ্র তাঁর হাতে অর্পণ করলেন ইংরেজি বন্দেমাতরম্' কাগজের কার্যভার। সেই পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করলেন— দুর্বলের মতো পরের কাছে আর ভিক্ষা নয়। আবেদন নিবেদন নয়। চাই স্বাধীন দেশের জীবন— পূর্ণ স্বরাজ।' তিনি লিখলেন, 'দুয়ারে মায়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তিনি প্রবেশের আগে অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করছেন সেই ডাক শোনার জন্য সে ডাক সত্যের ডাক, সে ডাক আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত। তিনি শুধু চান আমাদের মন, আমাদের প্রাণ। তিনি আমাদের ডেকে বলেছেন— তোমরা কতজন আমার জন্য বাঁচতে চাও? কতজন আমার জন্য প্রাণ দিতে পার? মা আমাদের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন।' শ্রীঅরবিন্দের কলম দিয়ে তখন আগুন ছুটছে। ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দের লেখার তেজ দেখে ভয় পেল। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জাতীয় কলেজ যাতে রাজনৈতিক হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তিনি অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করলেন।

৩০ এপ্রিল ১৯০৮ মজফ্‌ফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর ছোঁড়া বোমায় প্রাণ দিলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি। লক্ষ্য ছিল কিংসফোর্ড। শ্রীঅরবিন্দ কারারুদ্ধ হলেন। শুরু হলো ঐতিহাসিক 'আলিপুর বোমা মামলা'। কারাগার হলো তার যোগাশ্রম। সারাক্ষণ ধ্যানস্থ থাকেন। জেলের মধ্যেই তিনি ভগবান দর্শন করেন। যেদিকে তাকান দেখেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সামনে দেখেন গাছ, গাছ তো নয় যেন স্বয়ং বাসুদেব। সেপাই সান্ত্রীরা চলাফেরা করছে, তিনি দেখছেন বাসুদেব তাকে পাহারা দিচ্ছেন। কম্বলে শুয়ে আছেন, মনে হয় যেন স্বয়ং নারায়ণ তাঁকে কোলে করে রয়েছেন। জেলের সব কয়েদিদের দিকে তাকান, দেখেন তাদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং নারায়ণ। তিনি তাকে ডেকে বলছেন, 'এদের জন্য আমার হয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে। তাই তোমাকে এখানে এনেছি। এই মূঢ় ম্লান জাতিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি আছি এদের মধ্যে। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার এই মামলার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে আরও বড়ো কাজ করতে হবে।'

৬ মে ১৯০৯। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। নতুন দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ইংরেজিতে 'কর্মযোগিন' আর বাংলায় 'ধর্ম্ম'। কিন্তু জেলের মধ্যে বাসুদেব দর্শনের ফলে তিনি রাজনৈতিক বিমুখতার কবলে পড়লেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, 'যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। এই ধর্মের জন্য এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড়ো করে তোলার অর্থ দেশকেই বড়ো করে তোলা। ...জগতের সম্মুখে হিন্দুধর্মের রক্ষা ও অভ্যুত্থান— আমাদের সামনে এটিই হলো কাজ। কিন্তু হিন্দুধর্ম কী? এই যে ধর্মকে আমরা বলি সনাতন, সর্বকালিক— এই ধর্ম কী? এটি হিন্দু ধর্ম, কেবল এই জন্যই যে, হিন্দুজাতি এই ধর্মকে রেখেছে, হিমালয় ও সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম গড়ে উঠেছে। ...যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি বস্তুত সেটি হচ্ছে সনাতন ধর্ম, কারণ সেটি বিশ্বজনীন ধর্ম, অন্য সকল ধর্মই তার অন্তর্গত। কোনো ধর্ম যদি সর্বজনীন না হয় তবে তা সনাতন হতে পারে না। এটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানবজাতিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, ভগবান আমাদের কত নিকট, কত আপনার, মানুষ যতরকম সাধনার দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে সবই এর অন্তর্গত। ...আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দু জাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে; যখন সনাতন ধর্মের অবনত হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো, তাহলে সনাতন সনাতন ধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাই ধ্বংস হতো।'

ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে এরপর শ্রীঅরবিন্দ কিছুদিন চন্দননগরে আত্মগোপন করে থাকেন। সেখান থেকেই জাহাজে পণ্ডিচেরী চলে আসেন। এখানেই শুরু তাঁর জীবনের আর এক নতুন অধ্যায়। ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল, পণ্ডিচেরীতে তিনি সাধনায় মগ্ন হলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির জন্য, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-শোক, জরা মৃত্যু থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীঅরবিন্দের এই সাধনা। তিনি বুঝলেন ভারত স্বাধীন হবেই। কিন্তু তারপর? বাকি যাত্রাপথে কী হবে ভারতের কাজ ও আদর্শ? একটি বাক্যে তিনি বলেছেন— 'India would be able to fulfil her mission and destiny which is to lead humanity to the light of the spirit.' জগৎকে আত্মার আলোর পথ দেখাবে ভারত। সেই আলোর সাধনায় একটি ঘরের মধ্যে ২৫ বছর একটানা মগ্ন থাকলেন মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দ। এই সময়ে তিনি লিখলেন 'সাবিত্রী' এবং 'The Life Divine'। শেষোক্ত বইটির জন্য পাঁচবার তাঁর নামও প্রস্তাবিত হয়েছিল নোবেল পুরস্কারের জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র জীবন সাধনা অখণ্ড মাতৃভূমিকে সামনে রেখেই সিদ্ধিলাভ হয়েছে। অখণ্ড ভারতমাতাই ছিল তাঁর সাধনার কেন্দ্র। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় হয়। নিবেদিতার সাধনার অন্যতম দিক ছিল 'অখণ্ড ভারত'। নিবেদিতা এক জায়গায় তাঁর ভাষণে বলেছেন, 'মাতৃভূমি ভারতবর্ষ বস্তুত অখণ্ড। উত্তর ও দক্ষিণাংশ পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই রাজনীতি, জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে কোনো ভূভাগের ইতিহাস কখনো ভারতের প্রকৃত ইতিহাস হইতে পারে না।' ভগিনী নিবেদিতার এই অখণ্ড ভারত চেতনার প্রভাব শ্রীঅরবিন্দের ওপর পড়েছিল।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেলাম, কিন্তু তা হলো খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। অরবিন্দ এই খণ্ডিত স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেননি। এই ভারত ভূমিকে তিনি জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, 'তিনিই জগন্মাতা, আদিশক্তি, মহামায়া ও মহাদুর্গা— আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি ও তাঁর পূজা করতে পারি।' তিনি এই দেশকে নদী-পাহাড়-মাঠ-ময়দানের সমষ্টি হিসেবে দেখতেন না। এ এক চিন্ময়ীসত্তা অর্থাৎ চৈতন্যময় অস্তিত্ব। চৈতন্যকে ভাগ করা যায় না। তাই ভারতের ভূমি ভাগ করা হলেও, তার আত্মাকে ভাগ করা যায় না। এই ভাগ স্বাভাবিক নয়। এই ভাগ কৃত্রিম। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়— 'Partition shall and must go.' এটাই নিয়তি, এটাই মায়ের ইচ্ছা।

প্রবল প্রতাপান্বিত আমেরিকার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে উত্তর ভিয়েতনাম ও পশ্চিম ভিয়েতনাম যদি জোড়া লাগতে পারে, কমিউনিস্ট শাসনকে উপেক্ষা করে যদি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি জোড়া লাগতে পারে, ১৮০০ বছর পর ইহুদিরা যদি তাদের হৃত জমি ফিরে পেতে পারে— তা হলে ৭৮ বছর আগের হারানো জমি আমরা কেন উদ্ধার করতে পারব না? চাই বিশ্বাস, সংকল্প, সাহস ও সক্রিয়তা। ভারতবাসীকে ঋষিবাক্যের ওপর ভরসা রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। □

ফঃ ৫

১৬ আগস্ট—১৯৪৬

কলকাতায় হিন্দু নিধন ও প্রতিরোধ

গোপাল চক্রবর্তী

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বজ্রমুষ্টি অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছিল। আর তখন থেকে মুসলিম লিগ গোপন ষড়যন্ত্র, আর প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে বঙ্গপ্রদেশে একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভা অংশগ্রহণ করে। অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিম লিগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। হোসেন সুরাবর্দি হলেন বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)। এই সময়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা আরও জোরালো হয়। সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের কর্মপরিষদ পরিষ্কারভাবে বলতে থাকে— এখন থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের’ ডাক দিতে হবে। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন নির্দিষ্ট হয়। এইদিন প্রত্যেকটি মসজিদে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি মসজিদে লিগের তিনজন করে সদস্যকে নিযুক্ত করতে হবে শুক্রবার ১৬ আগস্টে। এই সদস্যরা সকলের কাছে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবে।

হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিনাশ করবার জন্য মুসলমানদের প্রতি একটি গোপন নির্দেশনামা প্রচারিত হলো। তার প্রধান প্রধান নির্দেশগুলি হলো—

- ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন।
- পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।
- হিন্দু-সহ সমস্ত ভারতবাসীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে।
- হিন্দুদের অধীন এবং হিন্দুদের মালিকানাধীন সমস্ত কারখানা ও দোকানগুলিকে পুড়িয়ে দিতে হবে, ধ্বংস করতে হবে, লুঠ করতে হবে এবং লুঠের সামগ্রী লিগের অফিসে জমা দিতে হবে।
- মুসলিম লিগের সদস্য সমর্থকরা অবশ্যই আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সঙ্গে রাখবেন।
- হিন্দুদের হত্যা করে তাদের জনসংখ্যার হার কমিয়ে আনতে হবে।
- সমস্ত মন্দির ধ্বংস করতে হবে।
- মুসলিম লিগের গুপ্তচররা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলা এবং গ্রামে সক্রিয় থাকবেন।
- মুসলমানরা সারা ভারতবর্ষের বুকে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করবে। ভারতবর্ষের যেন সর্বত্র মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।
- মুসলিম লিগের সমস্ত কেন্দ্রের সদস্যরা তাদের সঙ্গে অস্ত্র বহন করবেন। যার সাহায্যে হিন্দুদের প্রাণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট করা সম্ভব হয়।
- হিন্দু স্ত্রীলোক ও বালিকাদের ধর্ষণ করতে হবে, অপহরণ করতে হবে এবং ১৯৪৬ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে তাদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হবে। তাদের সমস্ত সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা হবে।
- লিগ সমর্থকেরা হিন্দুদের প্রতি সদাসর্বদা নির্মম মনোভাব পোষণ করবে। হিন্দুদের সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করা হবে।

এই নির্দেশনামার প্রতিলিপি লিগ কার্যালয় থেকে প্রত্যেক লিগ সমর্থকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো।

বিভিন্ন প্রচারপত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামে’ অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হলো। যেমন— ‘পাকিস্তান আমাদের স্বপ্ন, ১৬ আগস্ট তারিখে আমরা সর্বভারতীয় হরতাল পালন করবো। এটি হলো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। এই দিনই সর্বভারতীয় সংঘর্ষ শুরু হবে। পাকিস্তান সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এই সংঘর্ষ থামবে না।’

আর একটি পুস্তিকার মাধ্যমে বলা হয়েছিল— ‘ভারতে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে,

আমাদের সকলের হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি থাকবে, আমরা আগামীকাল অর্থাৎ ১৬ আগস্ট তারিখে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করবো যাতে কেউ ঘুমাতে পারবে না।'

হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) যার মাধ্যমে বলা হয় যেন কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িকতাকে বৃদ্ধি করার ধৃষ্টতা না করা হয়। হিন্দুদের সংযত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একবারও বলা হয়নি আক্রান্ত হলে তোমরা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থেকো।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত মুসলিম লিগ। বাইরের জেলাগুলি থেকে দাঙ্গাকারীরা এসে হাজির হয়েছে। রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, খিদিরপুর, লালাবাগান অঞ্চলের দাঙ্গাবাজরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে। ৮নং জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট এবং নাখোদা মসজিদে বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি এবং কলকাতার মেয়র উসমান দাঙ্গাবাজদের হাতে ঢালাও পেট্রলের কুপন বিলি করেন যাতে তারা সহজে অগ্নিসংযোগ করতে পারে।

প্রত্যাশা মতো ১৬ আগস্ট ভোর থেকেই ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। প্রথম আক্রমণের ঘটনা ঘটে মানিকতলায়। ক্রমে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, বউবাজার স্ট্রিট লোয়ার সার্কুলার রোডে হিন্দুরা আক্রান্ত হতে থাকে। শিয়ালদহ অঞ্চলের অবস্থা এক সময়ে খুবই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। রিপন স্ট্রিট, ওয়েলসলি স্ট্রিট এবং মল্লিকবাজারে মুসলমানদের দ্বারা ছুরিকাহত হয়ে বহু হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে। শ্যামবাজার থেকে ওয়াটগঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্রই এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গড়পার অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। খালের পশ্চিমদিকে অসংখ্য হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি হিন্দুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা সুরাবর্দি ও ওসমানের পেট্রলের কুপন ছাড়াও, বউবাজার, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের পেট্রলপাম্পগুলিতে ব্যাপক লুঠতরাজ করে। মেয়র উসমান কর্পোরেশনের লরিগুলি দাঙ্গাকারীদের হাতে তুলে দেন। একইভাবে ব্যবসায়ী ইস্পাহানির লরিগুলিও

গোপাল চন্দ্র মুখার্জি

দাঙ্গাকারীদের হাতে আসে।

১৬ আগস্ট কলকাতা মনুমেন্টে মুসলিম লিগের বিশাল সমাবেশে সুরাবর্দি, নাজিমউদ্দিন ও উসমান এমন উত্তেজক বক্তৃতা দিলেন তাতে উজ্জীবিত হয়ে ফেরার পথে মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা, হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ, অবাধ লুঠপাট এবং ব্যাপক অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে সমগ্র কলকাতাকে এক বিভীষিকাময় নরকে পরিণত করে। স্লোগান ওঠে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান।' 'শালা হিন্দু লোগকো মার ডালো।'

আক্রান্ত হিন্দুরা সাহায্যের জন্য বারবার লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগ করেও কোনো সাহায্য পায়নি। কারণ কন্ট্রোলরুম আগলে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি এবং মেয়র উসমান। তাঁদের কড়া নির্দেশ পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে না। পরেরদিন ১৭ আগস্ট সুরাবর্দি লালবাজারের দখল ছাড়েননি। সেখানে বসেই তিনি হিন্দুদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করছেন। ১৭ আগস্ট আবার মুসলমানরা ব্যাপকভাবে দাঙ্গা শুরু করল। কিন্তু ওইদিন দুপুরের পর থেকে দাঙ্গার গতি প্রকৃতি পালটে গেল। ডাকাবুকো গোপাল মুখার্জি, মানুষের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ানো তাঁর স্বভাব। 'জাতির আর্তত্রাণ সমিতি' নামে তাঁর একটি যুব সংগঠনও আছে। পেশাগত কারণে তাঁর একটি উপনামও রয়েছে। মুসলমানদের এক তরফা আক্রমণে যখন হাজার হাজার নিরীহ হিন্দুর প্রাণ যাচ্ছে, মা-বোনেরা ধর্ষিতা হচ্ছে, সম্পত্তি লুঠ হচ্ছে, হিন্দুর বাড়িঘর ভস্মীভূত হচ্ছে, তখন শহরের কিছু হিন্দুনেতা গোপালকে অনুরোধ করলেন প্রতিরোধে নামার জন্য। তাঁর দলের ছেলেরাও চারদিক থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর নিয়ে আসছে। এবার সশস্ত্র প্রতিরোধে নামলেন গোপাল মুখার্জি। সঙ্গে পেলেন যুগল ঘোষ, বিজয় সিংহ নাহার, রাম চ্যাটার্জির মতো সংগঠকদের।

মুসলিম লিগের গুন্ডারা ভাবতেও পারেনি তাদের এমন কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে। লিগের গুন্ডারা যেখানে আক্রমণ করছে, সেখানে প্রতিরোধ পালটা মার। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে শিখ ও হিন্দু যুবকরা তখন এই প্রতিরোধে যোগ দিচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব, আখড়ার সদস্যরাও এই প্রতিরোধে শামিল হয়। রাজাবাজার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীদের উপর যে পৈশাচিক আক্রমণ চালানো হয় তা দেখে বা শুনে কোনো বিবেকবান হিন্দুযুবক নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না। কলকাতার মাড়োয়ারি এবং জৈন ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধের জন্য অর্থের সংস্থান করেন। জেহাদিরা যখন পালটা মার খাচ্ছে এবং কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে, তখন সুরাবর্দি সেই দাঙ্গাবাজদের বাঁচানোর জন্য কার্ফু জারি করে সেনা নামানোর নির্দেশ দেন।

কত হিন্দু এই সময়ে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। কারও মতে দশ হাজার, কেউ বলছে বিশ হাজার। আবার কারও মতে সেদিন ত্রিশ হাজার হিন্দু প্রাণ দিয়েছে। হিন্দুদের মনে রাখতে হবে, সেই জেহাদিদের বংশধরেরা এখনো আছে এবং এই পশ্চিমবঙ্গেই তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্যে। □

বিরল নির্লোভ চরিত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামী হৃষীকেশ চক্রবর্তী

মিঠু চক্রবর্তী

হৃষীকেশ চক্রবর্তী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের যুগলমিলনের এক অসামান্য রূপকার। ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্র, যৌবনকালে দক্ষ ফুটবলার, আবার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কর্মজীবনে সম্পূর্ণ শিক্ষক গুণান্বিত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হিসেবে তিনি উদ্ভাসিত। একই সঙ্গে নাট্যকার, অভিনেতা, সুগায়ক ও কবি হিসেবেও তাঁর উত্তরণ অসাধারণ।

কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট দর্জিপাড়ার যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পৌত্র এবং চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ও শৈবলিনী দেবীর পুত্র হৃষীকেশ চক্রবর্তী ৪ চৈত্র, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ ৩০, কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া-৭১১ ১০২-তে সুদীর্ঘকাল বসবাস শুরু করেন।

কাসুন্দিয়ার বকুলতলায় সরস্বতী স্কুলটি ১৯২২ সালে ১২ জানুয়ারি 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন' নামে প্রতিষ্ঠা লাভা করে। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তি হওয়া ছাত্র তথা স্কুলজীবনে বরাবর প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র হিসেবে গণ্য হবার বিরল কৃতিত্বের অধিকারী তিনি। শোনা যায়, সংস্কৃতে প্রভূত জ্ঞানাধিকারী ছাত্র হৃষীকেশ চক্রবর্তী নবম শ্রেণীর সংস্কৃত পরীক্ষায় সংস্কৃতের শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁকে বিষয়টিতে ১০০-র মধ্যে মোট ১০৫ নম্বর প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ বাবু'র জোরাজুরিতে প্রধান শিক্ষক ১০৫/১০০ নম্বর লিখতে বাধ্য হন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের জন্যে তিনি সন্ধ্যায় ও রাতে 'অ্যাটলাস' জাহাজের সারেং ও খালাসিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে উদ্দেশ্য সফল করেন। একাধারে দেশমাতৃকার আরাধনা ও শৃঙ্খল মোচনের জন্যে সংগ্রাম এবং অন্যধারে পড়াশোনার তাগিদ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। যেমন বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশের পর পুলিশের তাড়ানায় তাঁকে সেখান থেকে সিটি কলেজে, আবার সিটি কলেজ থেকে রিপন কলেজে ভর্তি হতে হয়। দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং পুত্রের প্রতি মৌন অথচ প্রকট প্রশ্রয় থাকা সত্ত্বেও এজি বেঙ্গলের প্রভাবশালী অ্যাকাউন্ট্যান্ট চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র হৃষীকেশ চক্রবর্তীকে গৃহত্যাগ করে আত্মগোপন করতে হয়। পুলিশের হয়রানি বন্ধ না হওয়ায় তাঁকে পড়াশোনা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ৩০ মাস কারাবাসের অধিকাংশ তিনি দমদম সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেলি জেলে ভূপতি মজুমদার, সুকুমার দত্ত, বিজয় সিংহ নাহার, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিপিন বিহারী বসু প্রমুখ বিশিষ্ট কারাসঙ্গীদের সঙ্গে কারাজীবন ভোগ করেন।

ছাত্রাবস্থায় তাঁর লেখা 'ভোলার বাঁশী' নামে একটা রচনা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। 'শিবপুর বাণীসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা হৃষীকেশ চক্রবর্তীর নিজস্ব রচনা 'দাস রঘুনাথ', 'গৌর গোপাল', 'নরোত্তম বিলাস' প্রভৃতি নাটকগুলি রচনা করে নিজেই 'নিতাই' চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করতেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠ, সাহিত্যপ্রীতি, সর্বোপরি অমায়িক ব্যবহারের জন্যে এলাহাবাদ সংস্কৃতি ও সাহিত্য সংসদ থেকে 'সাহিত্যরত্ন' ও 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি দুটি লাভ করেন।

যুবশক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের অনুরাগ বিস্তার করার মাধ্যম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষা মাধ্যম। ১৯৪১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (মেইন)-এর সহকারী শিক্ষক হিসেবে তিনি এই মাধ্যমকেই কাজে লাগান। কিন্তু পুলিশের তাড়না তাঁকে বেশিদিন শিক্ষকতা করতে দেয়নি।

অবশেষে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হাওড়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে প্রথমেই বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণের ব্যাপারে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ পদে এবং ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর অবসরের আগেই ৯ কার্তিক, ১৩৮২ সালে শেষ বাসস্থান ৭৯, কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া থেকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় স্থানান্তরিত করার পর দুরারোগ্য 'এনকেফেলাইটিস' রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র এবং দুই কন্যাকে মধ্যে রেখে যান। স্বাধীন সংগ্রামীদের জন্যে চালু হওয়া পেনশন ও স্বীকৃতির আবেদন করার জন্যে তাঁকে মৃত্যুর আগে সরকার থেকে অনুরোধ করা হলে, তিনি তা পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে তাঁকে বিরক্ত না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যে বিপ্লবী শিক্ষক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী নীরবে এক বিরল নির্লোভ চরিত্রের স্বাক্ষর রেখে পেছনে অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব ফেলে রেখে চলে গেলেন, তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কি আমরা কিছু ভাবতে পারি না?

(লেখিকা বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী)

কিংবদন্তী ম্যারাথন দৌড়বিদ ফৌজা সিংহের জীবনাবসান

নিলয় সামন্ত

গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ফৌজা সিংহ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৪ বছর। রাস্তায় হাঁটার সময় ভোগপুর থেকে আসা একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। মাথায় আঘাত পাওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখান সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। অজ্ঞাতনামা সেই চালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ফৌজা সিংহের মৃত্যুতে পঞ্জাবের গভর্নর গুলাব চাঁদ কাটারিয়া শোকবার্তায় বলেন, 'সর্দার ফৌজা সিংহের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত, তিনি ছিলেন কিংবদন্তী ম্যারাথনবিদ ও দৃঢ়তার প্রতীক।'

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ১৯১১ সালে কৃষক পরিবারে জন্ম ফৌজা সিংহের। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো ছিলেন তিনি। প্রথম শতবর্ষী দৌড়বিদ হিসেবে ম্যারাথন দৌড় শেষ করেন তিনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জিতেছেন অসংখ্য পদক। মাথায় পাগড়ি পরে দৌড়ানো, সহ্যক্ষমতা ও অ্যাথলেটিসিজমের জন্য 'দ্য টারবেনড টর্নেডো নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। নব্বইয়ের দশকে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালেও করোনা মহামারির সময় নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর টরন্টো মিটে ১০০ মিটার থেকে ৫ হাজার মিটার পর্যন্ত কয়েকটি ইভেন্ট ছিল ন্যূনতম ৯৫ বছর বয়সিদের জন্য সেখানে ৮টি বিশ্ব রেকর্ড গড়েন ফৌজা।

পা দুটি সরু ও দুর্বল হওয়ায় ৫ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত হাঁটতে পারতেন না ফৌজা সিংহ। এ জন্য ছোটোবেলায় অনেকে কটূক্তি করে তাঁকে 'ডান্ডা' (সরু লাঠি) নামে ডেকেছেন। তরুণ বয়সে অপেশাদার দৌড়বিদ ছিলেন তিনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার বছর দৌড়ানো ছেড়ে দেন। ১৯৯৪ সালের আগস্টে নির্মাণকাজের দুর্ঘটনায় পঞ্চম সন্তান কুলদীপ মারা যাওয়ার পরের বছর দৌড়ে ফেরেন ফৌজা। তার আগে স্ত্রী ও বড়ো মেয়েও ফৌজাকে ছেড়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। কাজের মানুষদের হারানোর এই শোককে শক্তি বানিয়ে ১৯৯৯ সালে দাতব্য কাজে ম্যারাথন দৌড় শুরু করেন ফৌজা। তাঁর প্রথম দৌড় ছিল অকালে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য।

ফৌজার প্রথম ম্যারাথন ছিল ২০০০ সালে লন্ডনে। ৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে দৌড় শেষ করেন, যেটা তাঁর সমবয়সি অন্য যেকোনো দৌড়বিদের চেয়ে ভালো টাইমিং। ২০০৩ টরন্টো ম্যারাথনে নিজের সেরা টাইমিং করেন ফৌজা। ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে দৌড় শেষ করেছিলেন। এর আট বছর পর টরন্টোতেই প্রথম শতবর্ষী অ্যাথলেট হিসেবে ম্যারাথন দৌড় শেষ করেন।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ২০১১ সালের ১৩ অক্টোবর টরন্টো মিটে ১০০ মিটার থেকে ৫ হাজার মিটার পর্যন্ত কয়েকটি ইভেন্ট ছিল ন্যূনতম ৯৫ বছর বয়সিদের জন্য। সেখানে ৮টি বিশ্ব রেকর্ড গড়েন ফৌজা। সে সময় ওন্টারিও মাস্টার্স অ্যাথলেটিকসের সহ সভাপতি ডগ স্মিথ বলেছিলেন, ফৌজার এই পারফরম্যান্স তাঁর দেখা 'সবচেয়ে বিস্ময়কর অর্জন।'

তিন দিন পর বিশ্বের প্রথম খ্যাতিমান শতবর্ষী অ্যাথলেট হিসেবে টরন্টো ওয়াটারফ্রন্ট ম্যারাথন (২৬.২ মাইল) ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ডে শেষ করেন ফৌজা। তাঁর প্রকৃত টাইমিং ছিল ৮ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৫ সেকেন্ড। অনেক দৌড়বিদ ১৪ মিনিট পর স্টার্টিং লাইনে পৌঁছেছিলেন। তবে একটি সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। পাসপোর্ট থাকলেও ম্যারাথন অফিশিয়াল কিংবা গিনেজ কর্তৃপক্ষকে ফৌজা তখন কোনো জন্মের সংশাপত্র দেখাতে পারেননি। শতবর্ষী অ্যাথলেট হিসেবে তাঁর অর্জন খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন আয়োজকেরা। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সে সময়ে গ্রামে নিয়মিত জন্মের সংশাপত্র দেওয়া হতো না। টরন্টো ওয়াটারফ্রন্ট ম্যারাথনে ফৌজার সেই অর্জন নিয়ে তাই আলোচনা হলেও বয়সের হিসেবে তা অফিসিয়ালি নিশ্চিত করতে পারেনি আয়োজক কর্তৃবপক্ষ।

সংবাদ সংস্থা এএফপি জানাচ্ছে, ফৌজা সিংহ ভারতীয় অনেক দৌড়বিদের প্রেরণার উৎস ছিলেন। তবে তারা এ-ও জানায় যে ওন্টারিও মাস্টার্সের অফিসিয়াল স্মিথ বলেছিলেন, 'আমি যতদূর জানি, সে বৈধ।' ২০১৬ সালে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষী অধ্যাপনা বিভাগের পরিচালক থমাস পার্লস এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, একজন শতবর্ষী মানুষের পক্ষে ২৬.২ মাইল দৌড়ানো সম্ভব, 'আমি বলছি না তিনি (ফৌজা সিংহ) তিনি (শতবর্ষী) ওই বয়সের। তবে ১০০ বছর বয়সির পক্ষে ম্যারাথন দৌড়ানো সম্ভব।'

২০১৬ সালে 'দ্য টাইমস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফৌজা সিংহ জানিয়েছিলেন, অফিসিয়াল স্বীকৃতির জন্য তিনি আয়োজকদের কৃপা প্রার্থনা করেননি, 'সবকিছু সবার সামনেই করেছি। তাতে কেউ প্রশ্ন তুলে সুখী হতে পারে, আবার বিশ্বাস করেও আনন্দ পেতে পারে।'

ঘটনা

জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা

১৯৩৬ সাল। মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের কাছে ফৈজপুরে কংগ্রেসের গ্রামীণ অধিবেশন শুরু হবে। কেননা গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন ভারতের আত্মা গ্রামেই রয়েছে। আর স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রামের মানুষকেও শামিল করা প্রয়োজন। তখন কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দেশের মানুষদের একটি মঞ্চ হিসেবে পরিচিত ছিল। সবাই তখন কংগ্রেসের সদস্য হতে পারতেন। সেবারই প্রথম কোনো গ্রামীণ এলাকায় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। এই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এই অধিবেশনেই সংবিধান সভা গঠনের পরিকল্পনার কথা ছিল।

তখন চরকাচিহ্নিত তেরঙ্গা পতাকাকেই ভারতের জাতীয় পতাকা বলা হতো। অধিবেশনের প্রথম দিনে পতাকা উত্তোলন করবেন জওহরলাল নেহরু। ৮০ ফুট উঁচু পতাকাদণ্ড। সমস্ত বড়ো বড়ো নেতা উপস্থিত। জওহরলাল নেহরু পতাকা উত্তোলন করতে শুরু করলেন। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। পতাকা মাঝ বরাবর উঠেছে। এমন সময় পতাকার দড়ি একেবারে উপরের কপিকল থেকে সরে গেল। পতাকা আর উপরে ওঠে না, নীচেও নামে না। মাঝখানে পতাকা আটকে থাকা মানে তো অশুভ। জাতীয় শোকের সময়ই তো পতাকা অর্ধনমিত থাকে। কী করা যাবে কেউ ভেবে পাচ্ছেন না।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে হালকা চেহারার এক যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি উপর দিকে একটু দেখে নিয়ে তরতর করে পতাকাদণ্ড বেয়ে ৮০ ফুট উপরে উঠে গেলেন। তরপরে কপিকল থেকে সরে যাওয়া দড়িটা ঠিক করে দিয়ে আবার সেভাবেই নেমে এলেন। এবার পণ্ডিত নেহরু ঠিকভাবে পতাকা উত্তোলন করলেন।

সকলে যুবককে বাহবা দিতে লাগলেন। পণ্ডিত নেহরু এগিয়ে এসে যুবকের সঙ্গে করমর্দন করলেন। নাম জিজ্ঞাসা করে জানলেন তার নাম কিশন সিংহ রাজপুত। বললেন, আগামীকাল তোমাকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন জানানো হবে।

দুঃখের বিষয় হলো, জওহরলাল নেহরু যখন জানতে পারলেন কিশন সিংহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন স্বয়ংসেবক, তখন তিনি তাকে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকার করলেন।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার এই ঘটনার কথা জানতে পেরে খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি ধুলিয়ার দেবপুরা শাখায় এক স্বয়ংসেবক সমাবেশে কিশন সিংহকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্মানিত করলেন এবং তার হাতে রুপোর কাপ তুলে দিলেন। ডাক্তারজী সেদিন স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে বলেন, মনে রাখতে হবে এই পতাকা শুধুমাত্র কংগ্রেসের পতাকা নয়, এই পতাকা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক এবং আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা। এর সম্মান আমাদের প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে হবে।

দেবব্রত ভৌমিক

জাতীয় উদ্যান

গুরু ঘাসিদাস

গুরু ঘাসিদাস জাতীয় উদ্যান ছত্তিশগড়ের কোরিয়া জেলা এবং মধ্যপ্রদেশের সিধি ও সিংরাউলি জেলাজুড়ে অবস্থিত। উদ্যানটি ৪৬৬.৬৫৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই উদ্যান মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও পর্ণমোচী বন দ্বারা আচ্ছাদিত। এই উদ্যানের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সেগুন, সাজ, সালাই, মহুয়া, শিশু, কারি, গর্জন ও কেন্দু। বাঁশবন এই উদ্যানের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে বাঘ, চিতাবাঘ, নীলগাই, শেয়াল, বন্য শুয়োর, বাইসন, হায়না, হরিণ, সজারু ইত্যাদি। পাখির মধ্যে টিয়া, বুলবুল, হাঁড়িচাচা, লালমাথা শকুন। এছাড়াও রয়েছে কোবরা, গোসাপ ও অজগরের মতো সরীসৃপ।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৮

সংখ্যাপাঠ:

১০০০-১০০০ সহস্রম্/দশশতম্।

২০০০-২০০০ দ্বিসহস্রম্।

৩০০০- ৩০০০ ত্রিসহস্রম্।

৪০০০-৪০০০ চতুস্সহস্রম্।

৫০০০-৫০০০ পঞ্চসহস্রম্।

৬০০০-৬০০০ ষট্‌সহস্রম্।

৭০০০-৭০০০ সপ্তসহস্রম্।

৮০০০-৮০০০ অষ্টসহস্রম্।

৯০০০-৯০০০ নবসহস্রম্।

১০,০০০-১০,০০০ অযুতম্/দশসহস্রম্।

ভালো কথা

গাঁদাফুল গাছ

অন্য বছরের চেয়ে এবছর খুব বৃষ্টি হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রথম বৃষ্টি হতেই বাবা একটা বড়ো গাঁদাফুলের গাছের ডালগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ওগুলোতে শেকড় গজিয়ে নতুন পাতা বেরিয়েছিল। এমাসের প্রথম দিকে ওগুলোকে সার দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিয়েছেন। এখন সব গাছই দেখতে সুন্দর হয়েছে। ঝাঁকড়াও হয়েছে। বাবা বললেন এগুলোতে অঘ্রান মাস থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করবে, তখন দেখবে কত মজা।

শ্রেয়া সরদার, নবমশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

বৃষ্টি

শুভঙ্কর সেন, দশমশ্রেণী, নামোপাড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া

পুরুলিয়াতে এত বৃষ্টি কভু দেখি নাই
বৃষ্টির জেরে মাঠে গিয়ে খেলার জো নাই।
বৃষ্টির দিনে স্কুলও ছুটি মজা কোথাও নাই
বৃষ্টির দিনে ঘরে থাকা আনন্দ কোথাও নাই।
বৃষ্টির দিনে ভাইটি আমার খুবই আনন্দে থাকে
বৃষ্টির দিনে ভিজে ভিজে যাকে তাকে ডাকে।
ভাইয়ের ডাকে বোনটি আমার ছুটে চলে আসে
ভাই-বোনেতে ভিজে ভিজে জোরে জোরে হাসে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

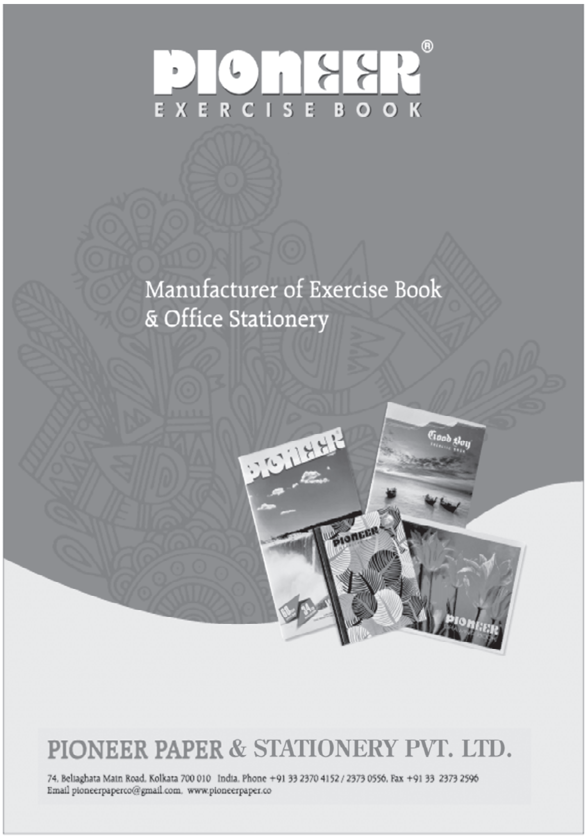

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বঙ্গের অবদান, বাঙ্গালির প্রাপ্তি

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

আচ্ছা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমানদের অবদান কী তা কি আমাদের জানা আছে? ১৮৫৭ সালে মহা বিদ্রোহের পর এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছিল তাতে কজন মুসলমান ভাগ নিয়েছিল? সারা দেশে ফাঁসির মঞ্চেই হোক বা পুলিশের গুলিতে— ক'জন ওই সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণ দিয়েছে? আন্দামানের সেলুলার জেলে বা রেঙ্গুনের কালকুঠুরিতে কজনই-বা যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগ করেছে বলতে পারবেন? না, বলতে পারবেন না। দু' একজন ব্যতিক্রমী বাদ দিলে সারা ভারতের এতো বড়ো স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো ভূমিকাই ছিল না। হিন্দুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা কোনোদিনই স্বাধীনতা আন্দোলনে পথে নামেনি। তাই গান্ধীজীকে ১৯১৯ সালে তাদের মন পেতে হাজার হাজার মাইল দূরের তুরস্কের খলিফাতন্ত্রের সমর্থনে 'খিলাফত' আন্দোলনকে সমর্থন করতে হয়েছিল, তাদের হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছিল।

১৯৯৭ সালে স্বাধীনতার পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ 'মৃত্যুঞ্জয়ী' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিল, তাতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সারাদেশের কয়েকশো হুতাত্মার নাম আছে। তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মাত্র একটি নাম— উত্তরপ্রদেশের আসফাকুল্লা খান। ১৯২৭ সালে কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁর ফাঁসি হয়েছে। সারা বইটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম খুঁজে পাবেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের যে তিনটি প্রদেশ বৈপ্লবিক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে পরিগণিত হয় সেই মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও বঙ্গের মধ্যে আমাদের বঙ্গের ইতিহাসটা কী? আমাদের পড়ানো হয় হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সংগ্রামে এদেশে স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু তথ্য কী বলে? ১৯৪৭ সালে দেশের স্বাধীনতার আগে অখণ্ড বঙ্গের মুসলমান ছিল ৫৪ শতাংশ, আর হিন্দু ছিল ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ বঙ্গ ছিল মুসলমান গরিষ্ঠ। তাহলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করলে প্রাণ দেওয়া বা জেলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমান বেশি আর হিন্দু কম হওয়ার কথা। এই বঙ্গে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে শুরু করে যে শতশত হুতাত্মার নাম আছে তারমধ্যে কজন মুসসলমান? মোট হুতাত্মার ৫৪ শতাংশ? আন্দামান বা মান্দালয়ে তাদের কতজনের নির্বাসন হয়েছিল, ৫৪ শতাংশ? আচ্ছা, ৫৪ শতাংশ না হোক, তার অর্ধেক ২৭ শতাংশ? আচ্ছা আরও কম ২০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ৫ শতাংশ? তাও নয়। ফাঁসিতে গুলিতে বা কালকুঠুরিতে অবর্ণনীয় অত্যাচার সয়েছে এরকম দু'চারটি নামও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

> **দেশ ভাগ হলো, বঙ্গ ভাগ হলো। হিন্দু গণহত্যার যারা কুশীলব তারা কিন্তু দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে গেল না। থেকে গেল এই পশ্চিমবঙ্গে। তারাই হয়তো গ্রামে গ্রামে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় এক 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের স্বপ্ন নিয়ে আবার কোনো ডাইরেক্ট অ্যাকশনের অপেক্ষায়।**

বিনয়-বাদল- দীনেশ, বাঘাযতীন-মাতঙ্গিনী-প্রীতিলতা, সূর্য সেন, লোকনাথ, মনোরঞ্জন— এরকম কয়েকশো নামের মধ্যে বঙ্গের দু'চারটি আব্দুল, আকবর, হজরত, বরকত আছে? না, নেই। অখণ্ড বঙ্গের কয়েকশো হুতাত্মার মধ্যে একজন মুসলমানের নাম আপনি খুঁজে দিতে পারবেন না। তবে দাঁড়াল কী? দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে ওই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব শূন্য। না, এ আমার বিশ্লেষণ নয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধে একই কথা বলেছেন, 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে। এদেশে চিত্ত তাহাদের নাই।'

১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে হিন্দু ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। আর মুসলমান ৮০ শতাংশ। অথচ মাস্টারদার বিপ্লবী বাহিনীর ১৫০ জন সদস্যই ছিলেন ২০ শতাংশ হিন্দুর মধ্য থেকে। ৮০ শতাংশ মুসলমানের একজনকেও কেন মাস্টারদা তাঁর দলে আনতে পারেননি? মাস্টারদা তো হিন্দুর হোমল্যান্ড তৈরির জন্য লড়াই করছিলেন না। তিনি সমগ্র ভারতকে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করছিলেন। মুসলমানরা কি নিজেদের

ফঃ ৬

ভারতীয় মনে করে না? তাহলে তাঁরা সেই সংগ্রামে তাঁর সঙ্গে আসেনি কেন?

বঙ্গপ্রদেশের প্রধান তিনটি সশস্ত্র বিপ্লবী দল— অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর ও বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার, এই তিন দলে কয়েক হাজার সদস্য ছিলেন যাঁরা দেশমায়ের শৃঙ্খল মোচনে হেলায় বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এদের মধ্যে একজন মুসলমান সদস্যের নাম বলতে পারবেন? না, পারবেন না। কারণ এদের একজনও এই দলে ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গের ৪৬ শতাংশ হিন্দু তো সক্রিয় ছিল, কিন্তু ৫৪ শতাংশ মুসলমান ছিল নিষ্ক্রিয়। শুধু নিষ্ক্রিয়ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সহযোগী। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ফরাসি দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁকে এক চিঠিতে আক্ষেপ করে লিখেছেন— 'খেলাফতের ব্যাপারে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সাহায্য করতে গিয়ে গান্ধীজী যা করেছেন, তাতে তিনি যা চেয়েছিলেন— সেই ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে কাজ করেননি। কাজ করেছেন ইসলামের ঔদ্ধত্য এবং শক্তির পক্ষে। এবং সেটাই হিন্দু মুসলমানের প্রচণ্ড অশান্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। এ ব্যাপারে শোযোক্তরা ইংরেজ সরকারের গোপন সমর্থনপুষ্ট প্ররোচক' (ভারতবর্ষ দিনপঞ্জী-অবন্তী কুমার সান্যাল)। তাঁর শেষ তিনটি শব্দবন্ধ 'গোপন সমর্থনপুষ্ট প্ররোচক'— তাদের কোন উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বিবৃত করে?

স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গপ্রদেশের কয়েকটি জেলার বীরত্ব ছিল অপরিসীম। তার মধ্যে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ছিল অগ্রণী। মেদিনীপুরের একজন জেলা মেজিস্ট্রেটও বিপ্লবীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বার্জ-পেডি-কিংসফোর্ড-ডগলাস সবাইকে বেঘোরে মরতে হয়েছিল বেঙ্গল ভলেন্টিয়ারের ১৭/১৮ বছরের ক্ষুদিরাম, প্রদ্যোৎ, অনাথবন্ধু, মৃগেনদের হাতে। এদের মধ্যে একজনও কিন্তু মুসলমান বিপ্লবী ছিল না। একইভাবে চট্টগ্রামের কথাও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। শুধু চট্টগ্রামই-বা কেন? বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, সিলেট, রংপুর— সর্বত্র সেদিন জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা। মাস্টারদার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মনোরঞ্জন- টেগরাদের জালালাবাদের পাহাড়ে অপরিসীম লড়াই— ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণের দল আত্মহুতি দিচ্ছিলেন স্বাধীনতার সেই মহাযজ্ঞে। কিন্তু তার মধ্যে কতজন মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল? একজনও নয়।

কিন্তু এত বিপ্লবের পরে যখন স্বাধীনতা পাওয়ার সময় এল তখন এরাই গর্ত থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এল নিজেদের দাবিসনদ নিয়ে। যে ৫৪ শতাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণই করল না, ইংরেজের অনুগত থেকে গুপ্তচরের কাজ করল, তারাই ১৯৪৭ সালে ভারত ভেঙে 'পাকিস্তান' গড়তে হাতে অস্ত্র তুলে নিল। দেশভাগের আগে সম্পূর্ণ বঙ্গ ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে এই নিয়ে ১৯৪৭ সালে ৬ জুলাই গণভোট হয়েছিল। পাকিস্তানের পক্ষে ভোট পড়েছিল ২,৮৯, ২৪৪টি ভোট আর ভারতের পক্ষে পড়েছিল মাত্র ২,৮৭৪টি ভোট। বঙ্গের ৯৯.০২ শতাংশ মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছিল। সেই ৯৯.০২ শতাংশ মুসলমান, যারা সারা বঙ্গপ্রদেশকে সেদিন পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল তারা তো দেশভাগের পর পাকিস্তানে ফিরে যায়নি? ড. শ্যামাপ্রসাদের তৈরি বাঙ্গালি হিন্দুর এই হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে বসে থেকেছে। তারাই তো আজ ছদ্ম বাঙ্গালির বেশ ধরে এই বঙ্গকে ঘুণ পোকার মতো কুরে কুরে খাচ্ছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরিয়ে দেশভাগের সময় সবচেয়ে বেশি দুর্দশায় পড়েছিল বাঙ্গালি হিন্দু। মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন কলকাতায়, নোয়াখালিতে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল, হাজার হাজার মা-বোন ধর্ষিতা হয়েছিল। কারা করেছিল সেই অত্যাচার? যারা স্বাধীনতার জন্য এক বিন্দুও রক্ত ঝরায়নি। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় তাদের বন্দুক-তরবারি— সব আলমারিতে তোলা ছিল। কিন্তু যেই স্বাধীনতা পাওয়ার সময় এল তখন আলাদা দেশের দাবিতে সেই অস্ত্রগুলি বেরিয়ে পড়ল। পাকিস্তানের দাবিতে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর যারা শরীরের ঘার রক্ত ঝরিয়ে দেশকে স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে ছিল। দেশ ভাগ হলো, বঙ্গ ভাগ হলো। হিন্দু গণহত্যার যারা কুশীলব তারা কিন্তু দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে গেল না। থেকে গেল এই পশ্চিমবঙ্গে। তারাই হয়তো গ্রামে গ্রামে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় এক 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের স্বপ্ন নিয়ে আবার কোনো ডাইরেক্ট অ্যাকশনের অপেক্ষায়।

বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা-মাস্টারদার বাংলাদেশ আজ তাঁদের বলিদানকে উপহাস করছে। তাঁদের বংশধরেরা আজ সেখানে প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার। আর ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, প্রফুল্ল,চাকী-সহ অজস্র বিপ্লবীর পশ্চিমবঙ্গ? সে কি আজ ভালো আছে? স্বাধীনতার পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করতে পারছে? নাকি তোষণের রাজনীতি তাদের আত্মাহুতিকে আজ আবারও এক প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে? পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে ইসলামি মোল্লাবাদের কালো আঁধারে ছেয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চুপ করে লুকিয়ে থাকা হায়না আর শেয়ালের দল ওতপেতে রয়েছে ড. শ্যামাপ্রসাদের গড়া বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে। সেই লক্ষ্যেই চলেছে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান অনুপ্রবেশ আর রোহিঙ্গা বসতি নির্মাণ।

একসময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় খুলনার শ্রীপুর থেকে পালিয়ে এসেছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে। প্রফুল্ল সেন খুলনার সেনাহাটি থেকে, প্রফুল্ল ঘোষ ঢাকার মালিকান্দা থেকে, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ঢাকার হাসাড়া থেকে, জ্যোতি বসু ঢাকার বাদরি থেকে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ফরিদপুরের ঊনশিয়া থেকে। এসেছিলেন ইসলামি পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুবহুল পশ্চিমবঙ্গে। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গও বাংলাদেশ হয়ে যায় তবে আর পালাবার পথ নেই। ঘরপোড়া হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখে আবার আতঙ্কিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বুঝি আবার ১৯৪৬/৪৭-এর ঘোর অন্ধকারময় দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছে। দিকে দিকে ক্যানিং, কালিয়াচক, ধূলিয়ান, সুতি, সামশেরগঞ্জ, কাশিমবাজার, মহেশতলা, শ্যামপুর— এর যেন বিরাম নেই। ওদিকে বাংলাদেশে হিন্দু বাঙ্গালি চরম অত্যাচারের শিকার, আর এদিকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালি এলাকায় প্রাণ বাঁচাতে, মা-বোনের সম্মান রক্ষায় ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিন্তু আর বুঝি পালাবার পথ নেই। বাঙ্গালি যদি এখুনিই না ঘুরে দাঁড়ায় তবে মুসলমান তোষণকারী দলগুলির হাতে পড়ে তাদের অবস্থা ১৯৪৬/৪৭-এর মতোই হবে। সেদিন তবু তাদের রক্ষায় একজন শ্যামাপ্রসাদ আর গোপাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন, কিন্তু আজ তাদের বাঁচাবার কেউ নেই। ওপার বঙ্গের হিন্দুর স্বাধীনতা তো শেষ হয়েছেই, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর স্বাধীনতাও আজ বিপন্ন। বাঙ্গালি হয় জাগো, নয় চির সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হও। □

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননা নাটকের বলি হিন্দুরা

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

জ্বলছে রংপুর, বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর— বাংলাদেশ জুড়ে এখন আগুন জ্বলছে। আকাশ ফেটে যাচ্ছে অসহায় হিন্দুদের কান্নায়। সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে হিন্দুদের। কীসের রাজনীতি? রাজনীতি একটাই 'সবাই মিলে হিন্দুশূন্য করার নিরলস কাজ করো, এইটাই শেষ সুযোগ'। কথাটি প্রচার করে চলেছে বাংলাদেশের পাকিস্তান সমর্থিত একটি জেহাদি গোষ্ঠী। যাদের সঙ্গে আতাত ও সখ্য রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার। হিন্দু মেয়ে অপহরণ করে ধর্ষণ, শেষে হত্যা। এইরূপ ঘটনার প্রেক্ষিতে বলা যায় হিন্দুদের আর কোনো উপায় রইল না মৃত্যু ছাড়া। এতো নির্মমতা পৃথিবী আগে দেখেছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু পাথর দিয়ে আঘাত করে করে মাথা ও শরীর থেতলে দিয়ে প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা খোদ রাজধানী ঢাকার বুকে— হানাদাররাও করেনি।

রংপুরের হিরণবালা দেবীর পরনের কাপড় খুলে নিয়ে বিবস্ত্র করে দিনেদুপুরে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। লজ্জা নিবারণের কোনো উপায় না থাকায় নগ্ন শরীরেই থাকতে হয়েছে অনেকক্ষণ। নৃশংস বর্বরতার এই রকম নমুনা পাকিস্তানিরাও সেদেশে করেনি। হিরণবালা দেবীকে নগ্ন করে আসলে ড. ইউনুসই তাঁর নগ্ন চেহারা প্রকাশ্যে আনলেন। এই জঘন্য ঘটনার বিবরণ দেশটির কোনো পত্রিকায় লেখা হয়নি। দেশের সব সাংবাদিক, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা— সবাই কাপুরুষ কিংবা নপুংশক হয়ে গেছে।

অবশ্য বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের ওপর আক্রমণ এখন আর বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়— এটা একটি পুনরাবৃত্তি, কাঠামোগত ও পরিকল্পিত নিপীড়নের ধারাবাহিকতা মাত্র। ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগের কল্পনাজাল রচনা করে বারবার সংঘটিত হয়ে চলেছে এই আক্রমণ। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছে মজহবি মোল্লাবাদের বিস্তার, ভূমি দখলের লোভ এবং দেশের নীরব-প্ররোচনামূলক ভূমিকা। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুসের আমলে এ আক্রমণ নতুন মাত্রা পেয়েছে, যেখানে মানবাধিকার কর্মী এবং মোল্লাবাদীরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলছে। ইউনুস হিন্দুদের জন্য অভিশাপ হয়ে এসেছে। মৃত্যু তাকে বিব্রত করে না। তার সুদের টাকা না মিটালে রংপুরের কায়দায় মহিলা ঋণ গ্রহীতাকে নগ্ন করে গাছের সঙ্গে বেঁধে পেটানোর ইতিহাস বাংলাদেশের গরিব লোকেরা ভুলে যায়নি। ইউনুসের নিজস্ব গ্রামে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এপর্যন্ত অন্তত কুড়ি হাজার মহিলাকে রংপুরের হিরণবালা দেবীর মতো দিবালোকে নগ্ন করে কিস্তি আদায় করা হয়েছে। সুদখোর ইউনুসের কাছে মানবতা, সভ্যতা কোনো ব্যাপার নয় তার আসল রূপ হলো অত্যধিক বিয়ে করে ছেড়ে দেওয়া, সুদের ব্যবসা চাঙ্গা করা। আর এখন তো পোয়াবারো, সরাসরি ক্ষমতায়। তাই বিরামহীন চলছে তাঁর লুণ্ঠন। তার হাতে শাসনযন্ত্র তো পুতুল মাত্র।

ধর্ম অবমাননার গুজব ছড়িয়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালানোর কৌশল বারবার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রতিটি ঘটনা এক এক ছক অনুযায়ী ঘটানো হয়— কোনো এক হিন্দু তরুণ ফেসবুক কিছু পোস্ট করেছে, কোনো মন্দিরে কথিত অবমাননাকর কিছু পাওয়া গেছে অথবা কোথাও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে— এই অভিযোগ তুলে একদল জেহাদি মুসলমানরা হিন্দুদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মন্দির পুড়িয়ে দেয়, এমনকী হত্যা করে ফেলে। অথচ ঘটনাগুলো পরে ভুয়া প্রমাণিত হলেও বিচার হয় না, ক্ষতিপূরণ মেলে না, বরং শাসকের ভূমিকা হয় নিষ্ক্রিয়, মৌন এবং পরোক্ষে উৎসাহদাতার মতো।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মহম্মদ ইউনুসের আমলেও এই রক্তাক্ত চিত্র তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক রূপ নিয়েছে। একদিকে 'শান্তি', 'গণতন্ত্র' ও

'মানবাধিকারের' বুলি, আর অন্যদিকে জেহাদি সন্ত্রাসের প্রশ্রয়— এই দ্বিচারিতা প্রমাণ করে, মুখে শেখ ফরিদ থাকলেও ইউনুসের আস্তিনে লুকিয়ে আছে জেহাদ ও ষড়যন্ত্রের ইট পাথর।

২০২৫ সালের জুলাই মাসে দেশের অন্তত ২৫টি জেলায় ধারাবাহিকভাবে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাগুলো এক ছকে বাঁধা। গাইবান্ধায় ফেসবুকে এক হিন্দু যুবকের নামে একটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে ৭টি হিন্দু বাড়ি ও দুটি মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সুনামগঞ্জে স্থানীয় এক কীর্তনের সময় কথিতভাবে 'অপমানজনক' শব্দ ব্যবহারের গুজব ছড়িয়ে পুরো পাড়াটিতে হামলা চালানো হয় এবং কীর্তন ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়। চট্টগ্রামে মন্দিরের ভেতরে 'ধর্মীয় গ্রন্থের অবমাননা' করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে চারটি দোকান ভাঙচুর করে জেহাদিরা। অবাক করার বিষয় হলো, প্রতিটি ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল দেরিতে আসা, অপর্যাপ্ত ও মুখরোচক বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকা। কোনো মূল হোতার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে দোষারোপ হিন্দুদেরই করা হয়েছে। শেষে ভুক্তভোগী হিন্দু পরিবারগুলোকেই 'শান্তি রক্ষার স্বার্থে' এলাকা ছাড়তে বলা হয় হিন্দুরা অনেকে সব কিছু ফেলে চলে এসেছে রাস্তায়।

ড. মহম্মদ ইউনুস নিজেকে বিশ্বশান্তির দূত, নোবেল বিজয়ী, মানবতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি এই ঘটনার কোনো দায় নিচ্ছেন না। তার কোনো বিবৃতি নেই, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো তদন্ত কমিটি নেই, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকেও নেই কোনো সমবেদনার বার্তা। এই মৌনতা কি শুধুই নিষ্ক্রিয়তা, নাকি একটি সুপরিকল্পিত গৃহসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ও ভূমি দখলের নীলনকশার নেপথ্য সম্মতি? জাতীয় সংখ্যালঘু পরিষদের তথ্য মতে, ২০২৫ সালের প্রথম ৬ মাসেই ধর্ম অবমাননার অজুহাতে দেশের ১৩২টি স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছে। অথচ এই হামলাগুলোর সবগুলিই ছিল মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে। প্রশাসনের নীরবতা এবং অপরাধীদের আড়াল করার প্রবণতা এই হামলাকে উৎসাহিত করে চলেছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ভূমি দখল, জেহাদি উগ্রবাদ এবং ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার— এই তিনটি জটিল কৌশলের মিলনস্থল হচ্ছে 'ধর্ম অবমাননার নাটক'। প্রথমে গুজব ছড়ানো হয়, তারপর স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা, তারপর জেহাদি জনতা এবং শেষে প্রশাসনের নীরব সম্মতি। এই হলো বাস্তব চিত্র। এই চিত্র দেখা গেছে রামুতে, নাসিরনগরে, শাল্লায়, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, কুমিল্লা, বরিশাল, রংপুরে— একের পর এক জেলায়। উদ্দেশ্য একটাই— ভয় সৃষ্টি করে হিন্দুদের ভূমি, ভোট ও অস্তিত্ব দখল করা। এখন দুই কৌশলেই চলছে 'বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য' করার পরিকল্পিত প্রয়াস।

ড. ইউনুস মুখে শেখ ফরিদের মানবতার কথা উদ্ধৃত করেন, অথচ তার সরকারের সময়েই হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, ধর্মান্তরণ, ধর্ষণ ও হত্যার হার বেড়েছে। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বলেন, অথচ তার প্রশাসন জামাতপন্থী, কওমিপন্থী ও পাকিস্তানঘেঁষা জেহাদিদের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছে। এসবই নীরব গণহত্যার নামান্তর।

বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার গুজবকে অস্ত্র করে হিন্দুদের উপর হামলা, দেশত্যাগে বাধ্য করা, ভূমি দখল, আর রাজনৈতিকভাবে নিঃস্ব করার যে ভয়ংকর কৌশল চলছে— তা এখন ইউনুস সরকারের হাতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই চরম ন্যায়হীনতা, নীরবতা ও পরোক্ষ মদতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তোলা সময়ের দাবি। সাহসী হিন্দুরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে প্রতিরোধের। কিন্তু প্রশাসন ও অস্ত্রের মুখে তারা অসহায়। জেহাদি উগ্রতা ও প্রশাসনিক মৌনতাকে একসঙ্গে গ্রহণ করা যায় না। শাসক যখন অন্যায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন ইতিহাস একদিন ঘৃণার অক্ষরে তার নাম লেখে। এইটাই ইতিহাসের নিয়ম।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত, গত ৩৩০ দিনে সংখ্যালঘুদের ওপর আড়াই হাজারেরও বেশি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এক তথ্য মতে, ২০২৫ সালের প্রথম ৬ মাসেই ৫৩২টি স্থানে হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার সবকয়টি ছিল মিথ্যা অভিযোগের ৯০৬৮টি ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং ২০০টি উপাসনালয় হামলার শিকার হয় এবং ৫৬ নিরীহ হিন্দু নিহত হন।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৯ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু, যা বর্তমানে কমে মাত্র ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবে সেটি ৬ শতাংশেরও কম। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, ধারাবাহিক নির্যাতন, ভূমি দখল এব দেশত্যাগে বাধ্য করার ফলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। ড. মহম্মদ ইউনুস নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং বিশ্বজুড়ে 'শান্তির দূত' হিসেবে পরিচিত, তার আমলে এই ভয়াবহ সহিংসতা এবং তার নীরবতা গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতার ঘটনা নিয়ে যে 'প্রচার-প্রচারণা' হচ্ছে, তা 'অপপ্রচার' বলা হচ্ছে এবং 'সংবাদমাধ্যমে খবরগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে সত্য তুলে ধরা হচ্ছে না। গত মে মাসে (২০২৫) মার্কিন কমিশনের সভাপতি স্টিফেন শ্নেকের সঙ্গে সাক্ষাতে ড. ইউনুস দাবি করেছিলেন, 'দেশের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।' কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এবং উপরোক্ত পরিসংখ্যান তাঁর এই দাবির বিপরীত চিত্র তুলে ধরে।

বাস্তব তথ্য এবং অন্যান্য রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমান সরকার জামাতপন্থী, কওমিপন্থী এবং পাকিস্তানঘেঁষা জেহাদিদের সঙ্গে আঁতাত করে চালাচ্ছে হিন্দু নির্যাতন।

ড. ইউনুসের নীরবতা এটাই প্রমাণ করে যে, মুখে 'শান্তি' আর 'মানবাধিকারের' বুলি আওড়ানো হলেও নেপথ্যে এক সুপরিকল্পিত নীলনকশা কাজ করছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলোপের এক নীরব প্রক্রিয়া। এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলের কি আরও সোচ্চার হওয়া উচিত নয়? □

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানগত পরিবর্তন
রাজনৈতিক অধঃপতনের একটি দৃষ্টান্ত

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক অবস্থান সময়ের সঙ্গে কতটা পালটাতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো অবৈধ ভোটার ও এনআরসি নিয়ে তার মন্তব্য ও কার্যকলাপ। রাজ্যের বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন (১৯৯৮-২০১১) তিনি বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন যে, বাম সরকার বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যে আশ্রয় দিয়ে ভোটব্যাংক গড়ে তুলছে। ২০০৫ সালে লোকসভায় একটি বিতর্কে তিনি স্পিকারের উদ্দেশ্যে রীতিমতো কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গে বৈধ ভোটার হয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন!' তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চালুর দাবিও তোলেন, যাতে এই অবৈধ ভোটারদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

২০১১ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তার এই অবস্থান পালটে যায়। সেই তৃণমূলনেত্রী যিনি একসময় অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী দশকে হয়ে ওঠেন এনআরসি ও সিএএ-র সবচেয়ে বড়ো বিরোধী কণ্ঠস্বর। ২০১৯ সালে অসমে এনআরসি-র কাজ চলাকালীন তিনি মন্তব্য করেন, 'এনআরসি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এর মাধ্যমে বাংলাভাষী ও মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি জীবিত থাকতে পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হতে দেব না।'

এই দুই অবস্থানের মধ্যে বৈপরীত্য পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এনআরসি বিরোধিতার মাধ্যমে তিনি তার ভোটব্যাংকের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী দলনেত্রী হিসেবে তার তৎকালীন অবস্থান ছিল সেই সময় রাজ্যের শাসকদল সিপিএমকে চাপে ফেলার প্রয়াস।

তবে প্রশ্ন ওঠে, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং আদর্শের মধ্যে তিনি কোনটাকে বেছে নিলেন? কী করে একজন নেত্রী এক দশকের মধ্যে দু'টি পরস্পর বিপরীতধর্মী অবস্থান নিতে পারেন? কেউ বলবেন এটি সুবিধাবাদী রাজনীতির অঙ্গ; কেউ বলবেন, এটি আদর্শচ্যুতি। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন ওঠে, উনি কি সে সময় শুধু নিজে জেতার জন্য এই ভোটারদের সরানোর দাবি করেছিলেন আর জিতে যাওয়ার পর, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর নিজের গদি সুরক্ষিত রাখতে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বানানোর সেই বাম আমলের সিস্টেম অব্যাহত রাখলেন?

যে বিষয়টিকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় তা হলো, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা বহু দশক ধরেই পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছেন। তাদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে সিএএ আইন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীরা নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য রাজ্যের শাসকদলের মদতে অবৈধভাবে তৈরি করেছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি পরিচয়পত্র। এই অবৈধ অনুপ্রবেশ বহু দশক ধরেই একটি বাস্তব সমস্যা, বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান পরিবর্তন এই জটিল বাস্তবতার প্রতিফলন। তার সাপেক্ষে এটি একদিকে যেমন রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, তেমনি অপরদিকে তার রাজনীতি ও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে এটি নানা নৈতিক প্রশ্নেরও উদ্রেক করে।

বামফ্রন্ট সরকারও তাদের দীর্ঘ শাসনকালে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কার্যত কোনো কঠোর পদক্ষেপ বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষার লক্ষ্যে তারা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে নীরব সম্মতিদান করেছে। বহুবার রাজনৈতিকভাবে সমালোচিত হলেও যা তারা লোকচক্ষুর আড়ালে করত, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তা প্রকাশ্যে রাজনীতির তাস হিসেবে তুলে ধরছেন। তিনি শুধু এই ভোটব্যাংক ব্যবহার করেননি, বরং তাদের জাল পরিচয়পত্র বানিয়ে দিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব দাবির সুযোগ, বাসস্থান, সরকারি সুযোগসুবিধা এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে নানাভাবে তাদের বৈধতা দান করেছেন। অনুপ্রবেশকারী তোষণকে এমন মাত্রায় তিনি নিয়ে গিয়েছেন যা হয়তো সিপিএমের সাহসেও কুলোয়নি। বাম আমলে যে অনুপ্রবেশ ছিল 'অনস্বীকার্য বাস্তবতা', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'উৎসবের মতো স্বীকৃত প্রক্রিয়া'। ফলে এই পুরো প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং নাগরিক অধিকার।

মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থানগত বৈপরীত্য শুধু রাজনৈতিক সুবিধাবাদের দৃষ্টান্ত নয়, ভারতীয় গণতন্ত্রের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে যিনি একসময় ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণ এবং দেশ থেকে অবৈধ ভোটারদের অপসারণের দাবি তুলেছিলেন, তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলেন 'কারুর কোনো নথি দেখানোর দরকার নেই', তখন তা ভারতীয় আইন-ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞার ইঙ্গিত দেয়। এই স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং ভোটারজের পরিচয় যাচাইয়ের মেতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়। নাগরিকত্বের মতো সংবেদনশীল বিষয়কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলার নীতি দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক বিভাজন এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

এই রাজনীতির ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকে অবহেলা বা অস্বীকার করার কারণে রাজ্যে বৈধ নাগরিকদের অধিকার হরণ, ভোটে কারচুপি এবং জনপ্রতিনিধিত্বের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নির্বাচন যে প্রকৃত অর্থে 'জনতার মতামতের প্রতিফলন'— তা নিশ্চিত করার দায় সরকার বা প্রশাসনের। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান ন্যূনতম নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে। যে 'ভোটার তালিকার শুদ্ধীকরণ' একদা ছিল তাঁর যাবতীয় লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু, আজ তা তার পক্ষ থেকেই উপেক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এই অবস্থান রাজ্যবাসীর মনে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থাহীনতার কারণ হয়ে উঠতে পারে, ভবিষ্যতের জন্য যা এক বিপজ্জনক সংকেত! □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩৩)

জেলের টুকিটাকি ও সত্যদর্শন

জেলে প্রবেশ মাত্রই ডাক্তারজীকে তাঁর আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দিতে হলো। তখন নিয়ম ছিল জেলের ভেতরে ঢোকার আগে বন্দিকে তার পৈতে খুলে রাখতে হবে। ডাক্তারজীকে সেকথা বলা হলে তিনি সরাসরি তা করতে অস্বীকার করেন। মর্যাদা রক্ষায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তা চোখে মুখে প্রকাশ পেল। ডাক্তারজীর মধ্যে সিদ্ধান্তের এমন কাঠিন্য, দৃঢ় সংকল্প দেখে কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে খুব চাপ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো। তাছাড়া তখনকার জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন মিঃ ফোর্ড এক আইরিশ ব্যক্তি। আইরিশরা সাধারণ ইংরেজ বিরোধী হয়। ডাক্তারজীর এই আত্মমর্যাদা বোধ তার খুব ভালো লেগেছিল। তিনি খুশিই হয়েছিলেন।

জেলে ডাক্তারজী সঙ্গে ছিলেন বাপুজী পাঠক, পণ্ডিত রাধামোহন গোকুলজী এবং বালবীর বাবুরাও হরকরে। কয়েকদিন পরে এল খিলাফত আন্দোলনের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বছর কুড়ি বয়সের তরুণ কাজী ইনামুল্লা খাঁ। কট্টর মুসলমান। বন্দিদের হাতে তৈরি কাগজ পালিশ করতে হতো। এ কাজে হাতে ফোস্কা পড়ে গেলে সবাইকে বই বাঁধাইয়ের কাজে দেওয়া হলো। ইনামুল্লা ছিল অসহিষ্ণু অন্ধ মজহবি মানসিকতার। একদিন দেখা গেল বই বাঁধাতে আঠা লাগানো বই ভারী কিছু দিয়ে চাপা দেওয়ার জন্য রামায়ণ উপরে রেখে তার ওপরে সে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ এ দৃশ্য চোখে পড়ায় ডাক্তারজী তো রেগে অগ্নিশর্মা। তার কাজের সঙ্গী হরকরেকে খুব বকাঝকা করলেন।

সকালবেলা মোরগ ডাক শুরু হতেই ইনামুল্লা উঠে পড়ল এবং উচ্চৈঃস্বরে কোরান পাঠ শুরু করল। সবাই অনুরোধ করল— ভাই, তুমি কোরান পড়ো ভালো কথা কিন্তু সকলের ঘুম নষ্ট করে এত উচ্চ রবে পাঠ কর কেন? কিন্তু কে শোনে কার কথা। সদুপদেশ শোনার মানসিকতা তার ছিল না। শেষে পণ্ডিত রাধামোহনজী ওই একই সময়ে ওর চেয়ে বেশি জোরে চেঁচিয়ে রামচরিত মানস পাঠ শুরু করলেন। ওষুধে কাজ হলো। এরপরে ইনামুল্লা উষাকালীন সুন্দর প্রাতঃ ঘুমটার আর ব্যাঘাত ঘটায়নি। ডাক্তারজী এবার পরিষ্কার বুঝতে পারলেন খিলাফত আন্দোলন আর 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' ঘোষণা মুসলমানদের আরও আলাদা ভাবতে সাহায্য করেছিল। কাজী ইনামুল্লার চরিত্রে তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল। কয়েকদিন তো সে পাঠকজী ও ডাক্তারজীকে ইসলাম মজহব বোঝাবার জন্য জোর কসরত শুরু করেছিল। আরও একদিন ইনামুল্লা বই বাঁধাই করতে রামায়ণ গ্রন্থের উপর দাঁড়াবার উদ্যোগী হলে হরকরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তার মনে বাসা বাঁধা শয়তানি পাগলামিকে দূরে রাখার উপদেশ দেন।

একদিন বিশ্রামের সময় ইনামুল্লা রকে বসে সবাইকে বলতে শুরু করলো— 'আপনারা আমাদের খিলাফতের সাহায্য করেছেন তাই আমরা অসহযোগ আন্দোলনে আপনাদের সঙ্গে আছি। গোরক্ষার বিষয়ে আমাদের কথা হলো 'গোহত্যা করো না' যখন প্রার্থনাপূর্বক বলবেন— তখন হয়তো আমরা গোহত্যা করব না, কিন্তু যখন আপনারা গোহত্যা বন্ধ করার জন্য জোর দেবেন, তখন গোরু কাটা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।' একথা শুনে বালবীরবাবুরাও হরকরের মাথায় আগুন চড়ে গেল; মুহূর্তে ইনামুলের দাড়ি টেনে ধরে কিল চড়-ঘুষি দিয়ে তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ডাক্তারজী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত করলেন— সংযত থাকতে বললেন। এ ঘটনার পরে ইনামুল্লাকে অন্য সেলে পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি ডাক্তারজীর কাছে খুব আশ্চর্যের ছিল না, কেননা তিনি খিলাফতের আসল সত্য আগেই অনুভব করেছিলেন, মুসলমানদের রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতার উদাহরণ আর একবার স্বচক্ষে দেখলেন। এ ছিল তাঁর কাছে এক সত্য দর্শন।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

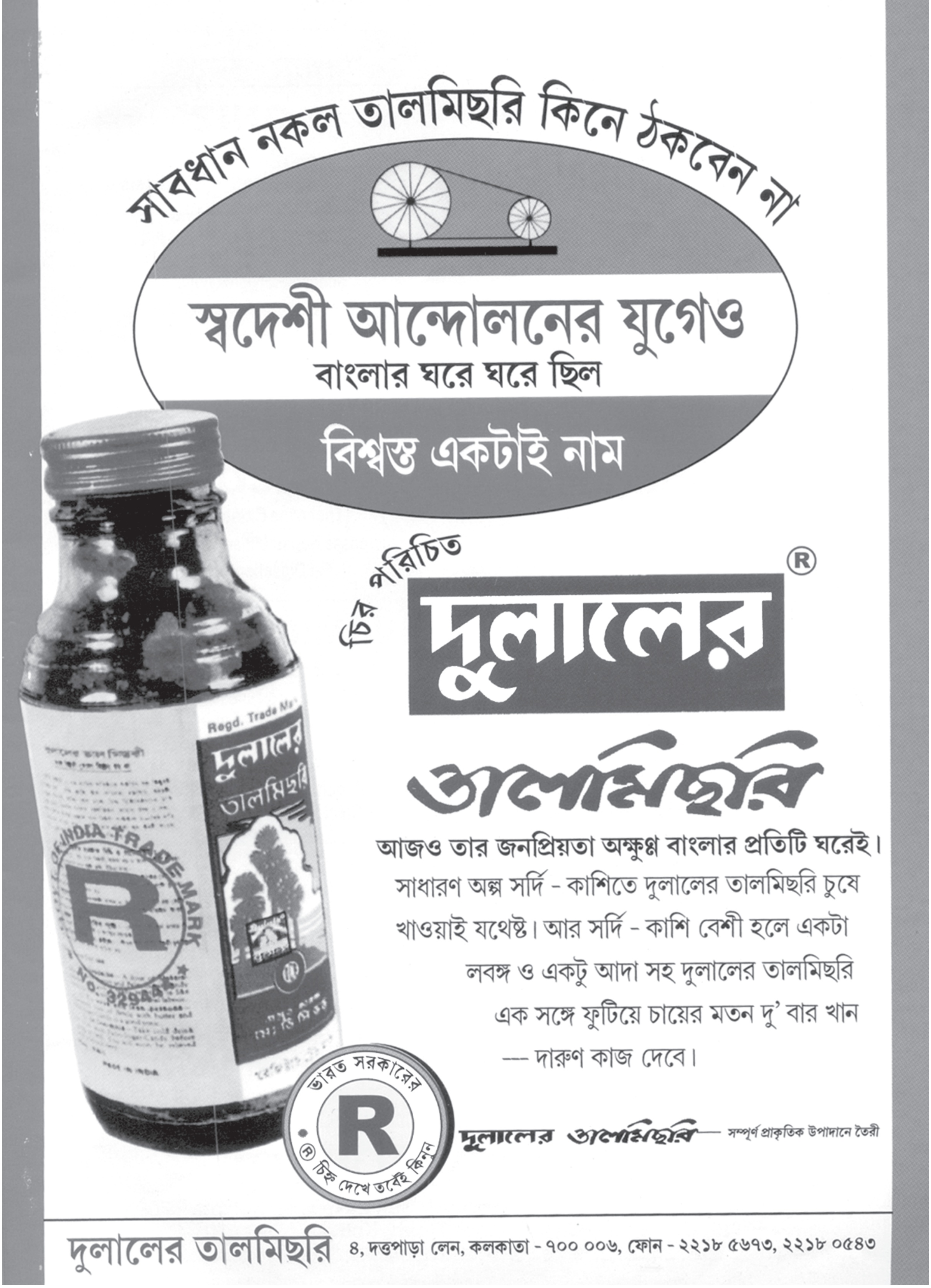
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
Regd. Trade Mark
দুলালের তালমিছরি
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবী প্রসঙ্গ, উপন্যাস
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা